প্রধান পাদক—

সোস্যালি ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা খপত্র (পাক্ষিক)

২য় বি ষ | সোমব ১লা মে, ১৯৫০, ১৮ই বৈশাখ, | আন

গণদাবী

যোশীচক্র বিতাড়িত, কিন্তু যোশীর সংস্কারবাদী

নিজেদের একমাত্র খাঁটী কম্যুনিষ্ট বলা, গলাবাজি আর সেই সঙ্গে অন্যান্যদের পুঁজিপতি শ্রেণীর দালাল বলে গালাগালি করা নিজেদের সাম্যবাদী প্রমাণ করার উপায় নয়, নিজেদের দলকে কাগজপত্তরে আদি ও অকৃত্রিম শ্রমিক শ্রেণীর দল বললেই তা বিপ্লবীদলে পরিণত হয় না। বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর দল বলে নিজেকে প্রমাণ করতে হয় দলীয় চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে, দলের কর্ম্মপদ্ধতির কষ্টিপাথরে। এর কোনটাকেই বাদ দিয়ে কোন মার্কসবাদী দল চলতে পারে না। Theory তার কাছে হল "the experience of the working-class movement in all countries taken in its general aspect," সবদেশের শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ অভিজ্ঞতা, "a guide to action" কর্ম্মপদ্ধতির পথনির্দ্দেশক। তেমনি practice তার কাছে হল Theoryর নির্ভুলতা যাচাই করার ক্ষেত্র, নতুন Theory জন্ম দেবার অভিজ্ঞতা। তাই যদি দেখা যায় কোন দলের চিন্তাপদ্ধতির মধ্যে ক্রমাগত ধারাবাহিক ভুলভ্রান্তি এবং কর্ম্মপদ্ধতির মাঝে উগ্রবামপন্থা ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতি, তাহলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সেইদল শ্রমিকদল বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট পার্টি নাম ব্যবহার করার শুধু অনুপযুক্তই নয়, এ নাম ব্যবহারের অধিকারও হারিয়েছে। ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে এই কথা একান্তভাবে খাটে।

আমরা একথা মানি, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এমন বহু কর্মী আছেন যাঁরা মনে প্রাণে চান এবং শুধু চানই না চেষ্টা করেনও যাতে তাঁদের দল প্রকৃত শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দল হিসাবে পরিণত হয়। অথচ তাঁদের সেই একান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও কেন তা এতদিনেও হয়নি এবং হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, সেকথা তাঁদের ভেবে দেখা দরকার। আমরা বহুদিন থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির কমরেডদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসছি, দল যখন শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মধ্যবিত্ত-শ্রেণী যখন দলের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়, তখন একদিকে যেমন দক্ষিণপন্থা সংস্কারবাদের গণ্ডীতে দল বাধা পড়তে পারে তেমনি সে চালিত হতে পারে উগ্রবামপন্থীয় অতিবিপ্লববাদ দ্বারা। সংস্কারবাদ আর অতিবিপ্লববাদ, এই দুটো জিনিষ হল যেন একটা টাকার দুটো পিঠ, উভয়ের জন্ম মধ্যবিত্তসুলভ ধৈর্য্যহীনতা ও দোদুল্যমানতার মধ্যে, উভয়ের শ্রেণীমূল রয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তাধারার মধ্যে। পুঁজিবাদের আক্রমণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন হতাশায় ডুবে সুবিধাবাদী সংস্কারবাদী নীতি গ্রহণ করে, তেমনি গ্রহণ করে নিজের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা ঢাকার জন্যে অতিবিপ্লবী ভূমিকা। এ ব্যাপার প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ইতিহাসে প্রমাণ রেখে গিয়েছে। কমরেড লেনিনও তাই তাঁর "Left-wing" Communism, an infantile disorder বইয়ে এদের সম্বন্ধে লিখেছেন —"The petty bourgeois 'driven to frenzy' by the horrors of Capitalism is a social phenomenon which, like anarchism, is characteristic of all Capitalist countries. The instability of such revolutionism, its barrenness, its liability to become swiftly transformed into submission,

লেখক—নীহার মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটীর সভ্য

apathy, fantasy and even a frenzied infatuation with one or another bourgeois fad—all this is a matter of common know ledge"

যেখানে একবার দক্ষিণপন্থা পর মুহূর্ত্তে বামপন্থা তারপর আবার দক্ষিণপন্থা, সংস্কারবাদ সুবিধাবাদ আর বামপন্থী অতিবিপ্লব বাদের মধ্যে দোদুল্যমানতার মূল কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিন্তা সেখানে যে দলের প্রধান গঠন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, সে দল যে একবার ডান দিকে আর একবার বাঁ দিকে দুলবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্বন্ধে তাঁদের নেতৃবৃন্দের স্বীকৃতি—"To take another instance, the Party in Bengaly and especially Calcutta, in spite of having led so many strikes is *almost exclusively* based on the non proletarian strata ie its composition is non-proletarian" (Struggle for people's Democracy & Socialism—Some questions of Strategy & Tactics, Communist—No. 4, 1949)। আর শুধু যে কলকাতা বা বাংলাদেশে পার্টি কেবলমাত্র মধ্যবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় অন্যান্য প্রদেশেও সেই একদশা— "One of the legacies of the reformist period is the overwhelmingly petty bourgeois composition of the Party. It was clearly revealed in our analysis of the composition of the Party Congress made by the Credential Committee" (ঐ প্রবন্ধ)। দলের নেতৃত্বও গড়ে উঠেছে এই Compositionর ওপর ভিত্তি করে, আর তাই সেই নেতৃত্ব একবার ডান পা তুলে আর একবার বাঁ-পা তুলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে এবং প্রতি পদক্ষেপে হোঁচট খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পা বদলে আগের ভুলের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে ছেড়ে দিচ্ছে। মার্কসবাদী কখনও ভুলে লজ্জা পায় না এই কথা বললেই জীবনভোর ভুলের বোঝাকে হাল্কা করা যায় না, নিজেদের দায়িত্ব এড়ান যায় না। এ কথার অর্থ হল, মার্কসবাদীরা যে মুহূর্ত্তে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে সেই মুহূর্ত্তে ভ্রান্ত নীতি ত্যাগ করে 'দ্বিগুণ উৎসাহে ঠিক পথে চলে।' তা না করে যদি এক ভুলের পর আর এক ভুল, তারপর আবার ভুল, শুধু ভুলের পর ভুলই করে কেউ চলে তা হলে তাকে কি মার্কসবাদী বলতে হবে? ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অতীতের মারাত্মক সব ভুলের কথা ছেড়ে দিলেও গত কয়েক বছরের ইতিহাস কি বলে?

যোশী সংস্কারবাদী তাই তাঁর নেতৃত্বের সময় গোটা দল সংস্কারবাদের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েছিল, একথা কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব প্রচার করে দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছেন। কোন শ্রমিক দলের নেতৃত্ব যে ব্যক্তি নেতৃত্ব হয় না এবং হলে সে দল যে শ্রমিক শ্রেণীর দল নয় একথা ছেড়ে দিয়েও জিজ্ঞাস্য বর্ত্তমান নেতৃত্ব তাকে কি ঠিক পথে চালাতে পেরেছেন? না অতি বিপ্লবী বামপন্থীয় বিচ্যুতির পথে ভেসে পড়ছেন? কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা আমাদের কথা শুনতেই চান নি, বুঝতেই চান নি, তাঁরা কোথায় এবং কেন উগ্র বামপন্থীয় বিচ্যুতিতে ভুগছেন। তাঁদের কয়েকটা বিষয় আমরা দেখিয়ে দিতে চাই। চোখ বুজে থাকলেই বিপদ এড়ানো যায় না; বিপদ কাটাতে হলে সংগ্রাম দরকার। তাই বোঝাও দরকার, বিপদ কোথায়। বহুবার আমরা বোঝাবার চেষ্টা করেছি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে mobilisation period, সংগঠন গড়ার, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি গড়ার সময়; ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুড়ান্ত সংগ্রামের বা এখনই গণমুক্তি ফৌজ গঠনের সময় নয়। সে কাজে এখনই নামলে ভারতবর্ষের বিপ্লবী শক্তিকে প্রস্তুতির আগে অকালে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সংগ্রামে নামিয়ে দিয়ে তার ধ্বংসই ডেকে আনা হবে। আর কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব তাঁদের নিজেদের মনোগত ইচ্ছাকে বাস্তব অবস্থা বলে বিবেচনা করে অবস্থাকে বিশ্লেষণ করলেন এই বলে যে, বর্ত্তমান সময়ে জনতা বিপ্লবের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তারা বুঝেছে পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুড়ান্ত সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই, পেছুবার কোন পথই নেই তাই গণযুদ্ধ এবং গণরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা তারা করছে "The masses are no longer old masses, afraid of terror always dragged back by illusion of secure life. They are the new masses on the *eve of revolutionary battles*—those who more and more realise that retreat is impossible. The partial struggles of the present period, therefore, become wide mass *battles*, miniature *Civil War*, which, when they are organised on a sufficiently big scale, *easily develop* to political battles and *throw up embryonic State* forms—such is the logic of the situation" (Comunist No. 4,1949,) নিজেদের মনের ইচ্ছাকে বাস্তব অবস্থা, logic of the situation প্রভৃতি যত বড় বড় বিশেষণে অভিহিত করা যাক না তাতে বাস্তব অবস্থা একটুও বদলায় না। তাই

চিন্তা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পরিচালিত করছে

কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে এই রকম গণ-অভ্যুত্থানের উপযুক্ত সময়েও কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচালিত আন্দোলনে কোটি কোটি জনতার যোগ দেওয়ার বদলে একটি লোকও যোগ দিল না দলের সভ্যরা ছাড়া। ফলে গণঅভ্যুত্থান রূপ নিল ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদে। বিপ্লবের শক্তি অগ্রগামী বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী একথা ভুলে গিয়ে দলের সাধারণ কর্মীদের মনোবল ঠিক রাখার জন্য বলা হতে লাগল, দলই বিপ্লব করবে তার নিজের দলীয় যান্ত্রিক প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে। গণঅভ্যুত্থান Civil war রূপ নিল নিরীহ জনতা, কোথাও কোথাও শ্রমিকের এবং মাঝে মাঝে পুলিশের ওপর দুএকটা পটকা আর এ্যাসিড বাল্‌ব ছোঁড়ায়। শ্রমিক শ্রেণী ছিন্নবিচ্ছিন্ন, প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদী সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং নগ্ন কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদী নেতৃত্ব দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত, দেশের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক চিন্তা শক্তিশালী হয়ে উঠছে, জনতা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ার বদলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় মেতে উঠেছে—এই অবস্থাকে বিপ্লবী অবস্থা ভাবা শুধু অমার্কসীয় নয়, বদ্ধউন্মাদতা কিংবা বাস্তব সম্পর্কহীন নিছক স্বপ্নবিলাস। ভারতবর্ষের বর্তমান সময়কে mobilisation এর সময়, নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল ও সংস্কারবাদী নেতৃত্বের কবল হতে শোষিত শ্রেণীকে জয় করার সময় বলে আমরা যে বিশ্লেষণ করেছি কমিনফর্ম তার সাম্প্রতিক প্রস্তাবে তা সমর্থন করেছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টিও বলতে শুরু করেছে অবস্থা অনুকূলে হলে গণফৌজ গঠন ইত্যাদি করতে হবে—"......the rallying of all classes willing to fight for national independence and the formation of a People's Liberation Army *when the necessary internal conditions allow for it*......will enable the working class of India......to lead the notional liberation struggle to victory." (Com B. T. Ranadive's statement dated 7th March, 50. published in Cross Road dated 10. 3. 50) দেশে যেখানে গণফৌজ গঠন করার উপযুক্ত অবস্থা আসেনি বলে বলা হচ্ছে সেখানে কি করে সেই সময়কে গণ-অভ্যুত্থানের সময় বলে বলা যায় তা সুস্থ মস্তিস্ক লোকের বুদ্ধির অগম্য। এ হল অতি বিপ্লবী বুকনী।

এই উগ্র অতিবিপ্লববাদের প্রভাবেই ট্রটস্কীপন্থীদের সঙ্গে গলার স্বর মিলিয়ে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বলতে বাধেনি মাও সে তুঙএর চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল। কমরেড মাওকে নিজেদের অজ্ঞতার ফলে বুঝতে না পারার জন্যই ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান রণদিভে নেতৃত্ব বলেছেন—"It must be admitted that some of Mao's formulations are such that no communist party can accept them; they are *in contradiction to the world understanding of the communist parties*,......No Marxist can ever agree with this (Mao's formulation—লেখক) *reactionary formulation* (Communist no—4)। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মুখে লেনিনবাদ ষ্ট্যালিনবাদের গাল ভরা কথা বলেও, এবং কমিনফর্মের দোহাই পেড়েও কার্য্যতঃ ট্রটস্কিপন্থী রণদিভেচক্র ভাবখানা দেখালেন এইরকম—মাও! সে আবার মার্কসবাদের বোঝে কি, আর তার কথা শোনেই বা কে? বিশ্বাস না হয় পড়ুন—"First, we must state emphatically that the Communist Party of India has accepted Marx, Engels, Lenin and Stalin as the authoritative sources of Marxism. It has not discovered new sources of Marxism beyond these. Nor for the matter of that is there *any communist party which declares adherence to so-called theory of new democracy alleged to be propounded by Mao* and declares it to be a new addition to Marxism (ঐ প্রবন্ধ)। এ কথা অবশ্য অনস্বীকার্য্য যে, ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কমরেড মাওকে সমালোচনা করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাঁর সঙ্গে এক মত নাও তাঁরা হতে পারেন যদি বিচারে দেখা যায় কমরেড মাও ভ্রান্ত। কিন্তু কোথায় সে সমালোচনা? আর তা নেই বলেই দুদিন আগে যে নেতৃত্বকে প্রতিক্রিয়াশীল বলতে রণদিভে প্রভৃতির বাধেনি তাঁরাই বলতে বাধ্য হলেন—কমরেড মাও লেনিনবাদ ও ষ্ট্যালিনবাদের শিক্ষাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং সেই নেতৃত্বের শিক্ষা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে চালিত করবে—"The lessons of the victorious people's liberation struggle in China, in which the Communist Party of China under the leadership of Comrade Mao Tse-tung *successfully applied the teachings of Lenin and Stalin, will be an unfailing guide to the Communist Party and the working class of India* in discharging its leading role in the national liberation struggle" (Com. B. T. Ranadive's statement dated 7th March, 50)। কমরেড মাও তাঁর formulation পরিবর্ত্তন করেননি। সুতরাং আগে যদি তাঁর formulation অমার্কসীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে তাহলে কেমন করে এখন তা মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্মত হল? হল তার কারণ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি আবার হোঁচট খেয়ে ডান পায়ে ভর দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাই বামপন্থী বুকনি গুটিয়ে নেবার চেষ্টা চলছে।

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি যে সংস্কারবাদ আর অতি বিপ্লববাদের মধ্যে ঘড়ির দোলকের মত একবার এদিক একবার ওদিক দোলা খাচ্ছে তা আগে প্রমাণ হয়েছে। আগেকার কথা ছেড়ে দিলেও কমরেড যোশীর আমলে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল, এ কথা কম্যুনিষ্ট পার্টি স্বীকার করেছে। কমরেড রণদিভের আমলে বামপন্থীয় উগ্র বিচ্যুতি নীতি চলছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। এবার আবার দক্ষিণে ফেরার চেষ্টা চলেছে দল ধ্বংসের মুখে আসার ফলে। আর এত হবেই। কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্ত্তমান নেতৃত্বই বলেছেন—There are open manifestation of Right reformism. Added to this is the new disease—the hidden manifestation of Right Reformism which masquerades as Left revolutionism as uncompromising struggle against reformism (communist No. 4, 1949)। বামপন্থীর উগ্রতা ঢিলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিয়েছে গোড়ার রোগ। একেবারে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ। তাঁরা বলতে আরম্ভ করেছেন—লক্ষ্য তাঁদের 'fight for national independence (Renadive's statement)। ১৫ই আগষ্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেও সংগ্রামের যে চরিত্র ছিল তাঁদের নতুন মতানুসারে এখনও তাই রয়েছে। অর্থাৎ "nothing has changed" theoryর পুনরাবির্ভাব। দেশীয় ধনিক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর যে গোটা ভারতবর্ষের সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কের একান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিয়েছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে মূলতঃ পুঁজিবাদবিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে এ কথা ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ভুলে গিয়েছে। আর ভুলে গিয়েছে বলেই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শ্রেণীবিন্যাস ও তাদের শ্রেণীচরিত্র নির্ণয়েও আগের সেই দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ভুল আবার এসে গিয়েছে। তাই কমরেড রণদিভে তাঁর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করেছেন—"The struggle for unity of the working class, the strengthening of the alliance of the working class with *all the peasantry* for for immediate introduction of the antifedual agrarian reform the rallying of all parties and classes willing to fight for national independence will remove all the hindrances and obstacles in the way of full unleasing of the national struggle of the Indian people against Anglo American imperialists and *ihe big bourgeoisie and feudal princes and landlords collaborating with them*" এ কথা বলার অর্থ হল কেবলমাত্র বড় বড় ধনী, big bourgeoisie, টাটা বিড়ালার মত পুঁজিপতিরা এবং সামন্ত প্রভু ও জমিদাররা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। সুতরাং আজকের দিনের সংগ্রাম তাদের বিরুদ্ধে। ফলে গোটা কৃষকশ্রেণীকেই, ধনী, মধ্য ও গরীবচাষীকে একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ধনী চাষীর বিরুদ্ধে গরীব চাষীর যে একটা সংগ্রামী ভূমিকা আছে তাকে অস্বীকার করে শ্রেণী সমন্বয়ের কথা প্রচার করা হয়েছে। ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্রের অনুপ্রবেশের ইতিহাস ও অবস্থা খোঁজ নিলে দেখা যায় আজকের দিনের ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের প্রধান শক্তি হল ধনী চাষী। অথচ সেই ধনী চাষীকে নিয়েই লড়বে গরীব চাষী। লড়বে ত বোঝা গেল। কিন্তু কি স্বার্থে এবং কার বিরুদ্ধে? ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত অবস্থাপন্ন মাঝারী চাষীর সংগঠন কৃষক সভা যেমন গরীব চাষী ও ক্ষেত মজুরদের

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শ্রেণী সংগ্রাম নয় শ্রেণী সমন্বয়, সমাজতন্ত্র নয়

Further in movements for social betterment or progress, we find people taking an initiative who have outgrown their mere class limitations and can think in terms of the human society as a whole and are moved to action hy that sentiment." (Radicalism—Shib Narayan Ray page 67)—সামাজিক অগ্রগতির ইতিহাসে দেখা যায় যাঁরা শ্রেণী চিন্তা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়ে সমগ্র মানব সমাজের কল্যান কামনা করেছেন তাঁরাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন—এই হল পণ্ডিতপ্রবর এম, এন, রায়ের সামাজিক অগ্রগতির কারণ নির্দ্দেশ। বর্ত্তমান মানব সমাজ হল শ্রেণী বিভক্ত সমাজ; "people cease to be masses become individuals" প্রভৃতি যত সুন্দর সুন্দর কথা বলা হোক না কেন, এ কথা কোন ক্রমে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এই শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ব্যক্তি কোন না কোন শ্রেণীস্বার্থ তার চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা নিজের জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক রক্ষা করে চলেছে। বর্ত্তমান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের একদিকে রয়েছে কায়েমী স্বার্থরক্ষাকারী শোষক ধনিকশ্রেণী আর অন্য প্রান্তে রয়েছে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী। প্রথমোক্ত শ্রেণী চাইছে বর্ত্তমান সমাজকে আগলে ধরে রক্ষা করতে আর শেষোক্ত শ্রেণী চাইছে এই সমাজকে ধ্বংস করে নতুন সুখী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে। এই দুই প্রধান শক্তির চারিপাশে অনেকগুলো উপশ্রেণী আছে যাদের শ্রেণীগত homogeneity, সাজাত্য, না থাকায় তারা একবার ধনিক শ্রেণীর দিকে আবার কখনও শ্রমিক শ্রেণীর দিকে ঝুঁকতে থাকে। প্রধান দুই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ধনিক শ্রেণীকে উৎখাত করে। এই অবস্থায় এমন কোন কাজ বা চিন্তা নেই যা শ্রেণী স্বার্থের উর্দ্ধে। শোষণ আর শোষণহীনতার মধ্যে সমন্বয় হতে পারে না; হোলে শোষণকেই মেনে নেওয়া হয় তা সে শোষণ আগের তুলনায় যতই না কেন কম, যতই না কেন নিরীহ চেহারার হোক। তাই এখন শ্রেণী বিমুক্ত হয়ে সমগ্র মানব সমাজের ভাল করার উপদেশ দেওয়ার সোজা অর্থ, শোষকশ্রেণীর স্বার্থে শোষিত শ্রেণীকে জুড়ে দেওয়া, শ্রেণী সংগ্রামের চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে শ্রেণী সমন্বয়ের চিন্তা প্রচার করা এবং কৌশলে বিপ্লবী শক্তির তীক্ষ্ণতা ভোঁতা করে দিয়ে কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করা।

"The leaders of the communist movement, Marx, Engels and Lenin are instances of this process" (ঐ pages 67-68')। মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের উদাহরণ রায়-সাহেবের মতবাদের স্বপক্ষে যায় না বরং তার বিরোধিতাই করে। এরা প্রত্যেকে অবশ্য বুদ্ধিজীবি শ্রেণীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানের মারফৎ ইতিহাসের শিক্ষাকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই এঁরা নিজেদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলেন। কোন বুদ্ধিজীবি নিজেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে বিমুক্ত করতে পারলেই শ্রেণীর উর্দ্ধে উঠে গেল এ কথা ভাবা ভুল কারণ এই রকম ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে এবং নিয়মিত ভাবে ধনিক শ্রেণী কিংবা শ্রমিক শ্রেণী যে কোন একটি শ্রেণীকে সাহায্য করতে সে বাধ্য। আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে মার্কস এঙ্গেলস লেনিন তাঁদের চিন্তা ও কর্ম্মপদ্ধতির দ্বারা সর্ব্ব রকমে নিজেদের স্বার্থ শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে একাঙ্গীভূত বলে প্রমাণ করেছেন। শ্রেণী সংগ্রামের চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের দোহাই পেড়ে শোষক শ্রেণীর শোষণকে বাঁচিয়ে রেখে শোষিত শ্রেণীর ভাল করার কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং কোন রকমেই বলা যায় না, তাঁরা বিশেষ কোন শ্রেণীর কথা বলেন নি।

লেখক—সনত দত্ত

এ সব কথা যে রায়সাহেবদের মগজে প্রবেশ করেনি, তা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শ্রেণী স্বার্থ এমনই জিনিষ যে, মার্কসবাদ এত পড়াশোনা করেও ভুল কথা প্রচার করতে হচ্ছে। রায়সাহেবের চেলা শিবনারায়ণবাবু লিখলেন—"The so-called revolutionary class rarely in actual practice, is found to offer the social leadership of the revolutionary struggle.... Even in the bourgeois revolutions of Europe, the initiative in the struggle for liberation came primarily from the literati and a dissatisfied section of the feudal class along, of course, with certain elements of the bourgeois class"। মার্কসবাদে বলে বিশেষ কোন সামাজিক অবস্থায় শাসক-শ্রেণী নিজ শ্রেণী স্বার্থরক্ষার্থে তৎকালীন সামাজিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ বাঁচিয়ে রাখতে চায় আর শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণী গুলি সে সামাজিক কাঠামো পালটিয়ে নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। স্বভাবতই শোষিত শ্রেণী উপশ্রেণীগুলির মধ্যে যে শ্রেণী সব চেয়ে সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেবার উপযোগী সেই শ্রেণীর হাতেই বিপ্লবের নেতৃত্ব থাকবে এবং নেতৃত্বের জোরে সেই শ্রেণীর ক্ষমতা করায়ত্ব করবে। নেতৃত্ব বলতে কোন শ্রেণীর কয়জন লোক প্রথম এল, কতদূর লড়লো সে কথা বোঝায় না। নেতৃত্ব কোন শ্রেণীর হাতে তা বুঝতে হলে বিচার করা দরকার, যে স্বার্থে বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে তা কোন শ্রেণীর অনুকূলে; বিপ্লব যে দর্শন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তা কোন শ্রেণীর দর্শন। ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে সর্ব্বহারাশ্রেণী সংগঠিত ও নেতৃত্ব দেবার মত উপযুক্ত না থাকায় এবং বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর তখন বিপ্লবী ভূমিকা ও সবচেয়ে সংগঠিত শ্রেণীশক্তি থাকায় তখনকার গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল বুর্জ্জোয়া শ্রেণী। আর তার হাতে নেতৃত্ব থাকার ফলেই সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা কাগজে পত্রে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল গণ-জীবনে তার প্রয়োগ হল না এবং তার পরিবর্ত্তে বুর্জ্জোয়া স্বার্থ রক্ষিত হল। একথা অবশ্য ঠিক সামন্ত শ্রেণীর কিছু লোক এই বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় ছিল। কিন্তু তাতে বিপ্লবের নেতৃত্বের চরিত্র পালটিয়ে যায়নি বরং কর্ম্ম ও চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা তারা নিজেদের বুর্জ্জোয়া শ্রেণীভুক্ত বলে প্রমাণ করেছে। প্রতি বিপ্লবেই বিপ্লববিরোধী শ্রেণী হতে কিছু কিছু লোক বিপ্লবের পক্ষ হয়ে লড়ে কিন্তু তাদের এই আসা class হিসেবে নয় elemcnt হিসেবে—শ্রেণী হিসেবে যোগদান নয় ব্যক্তি হিসেবে যোগদান। তাদের এই যোগদানকে শ্রেণীউর্দ্ধও বলা যায় না, সামন্ততন্ত্রের বাইরে এসে তারা বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর হয়ে লড়ে নিজেদের বুর্জোয়াশ্রেণীভুক্ত প্রমাণ করেছে বিপ্লব বিরোধী শ্রেণী বিপ্লবের সময় বিপ্লববিরোধীই থাকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণীর দায়িত্ব তবুও কিন্তু প্রথমে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে খাঁটি শ্রমিকদের মধ্যে হতে নয় declassed বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় হতে। এই কারণেই কমরেড লেনিন বলেছেন—"This consciousness (সমাজতান্ত্রিক সচেতনতা—লেখক) could only be brought to them from without." (What is to be done—Page 170)।

আর শ্রেণী বিষয়ে এই মনোভাব থাকার জন্যই রায়বাদী চিন্তা রূপ নিল গান্ধীবাদী রূপ—পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এখন সংগ্রাম নয়, এখনকার সংগ্রাম হচ্ছে কয়েকজন সমাজবিরোধী ধনিকের বিরুদ্ধে। একথা বলার মানে হল পুঁজিবাদ ত দোষের নয় কয়েকজন লোভী পুঁজিপতিই হল যত নষ্টের গোড়া। "In this phase of decadent capitalism, the basic struggle is not so much a class struggle as a social struggle, not primarily between capitalist and proletariat but between a few anti-social elements interested in maintaining the present decaying order and the overwhelming majority of the people with a common interest of subverting that order and of constructing a planned but libertarian society." (The Philosophy of Radicalism—Shibnarayan Ray)। এই সামাজিক সংঘর্ষের কোথাও নেই গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত। গড়ে যেতে হবে People's Committees যা হবে "the democratic people's states within the state of the existing vested interests।" পুঁজিবাদী শ্রেণী লক্ষ্মীছেলের মত তা গড়ে যেতে দেবে এবং সারা দেশব্যাপী গণ-কমিটি গঠন হয়ে গেলে তার নেতারা বলবেন—people's state of law হয়ে গিয়েছে; সুতরাং কায়েমী স্বার্থ-রক্ষাকারী রাষ্ট্রশক্তি বিদায় নাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তারাও people's committee-র হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে বিদায় নেবে। না নিলে—"its forcible

শ্রেণী উর্দ্ধ গণতন্ত্রের কথা

ধনতন্ত্র, নয়া মানবতাবাদের আসল বক্তব্য

overthrow becomes a mere matter of gesture।" কিন্তু যত গোলমাল এখানে। forcible overthrow হবে কি দিয়ে? বুকনির দাপটে কি সৈন্য পুলিশবাহিনী, আইন, আদালতকে চূর্ণ করা যাবে? না যতক্ষণে রা[illegible]ীরা পাঁয়তাড়া কসবেন ততক্ষণে শাসক শ্রেণী ভাড়াটে সৈন্য আর পুলিশ বাহিনী দিয়ে তাদেব ঠাণ্ডা গারদ আর ফাঁসির মঞ্চে লটকে দেবে? অবশ্য দশ মণ তেলও পুড়বে না রাধাও নাচবে না; রায়বাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ক্ষমতা চাইবে না এমনভাবে যাতে পুঁজিবাদী সমাজ গোসা করতে পারে ফলে তাদের ঠাণ্ডা গারদে ঢুকতে কিংবা ফাঁসির মঞ্চে উঠতে হবেও না। এ কথার সত্যতা মিলবে রায় সাহেবদেরই—"Both in its means and end, the social revolution of our time must follow the principle of democratic socialism." (Lessons of Recent History—Shib Narayan Ray) এই কথা হতে। Democratic socialism, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিপ্লব ও গণঅভ্যুত্থানে বিশ্বাস করে না; পরিষদ দখলের মারফৎ সমাজতন্ত্র আনা যায় এই হল তার মত। সুতরাং আগে যে forcible overthrowর কথা বলা হয়েছে ওটা ঠাট্টা কিংবা ধাপ্পা যে কোন একটা। তাই গান্ধীজী যে "হৃদয় পরিবর্তন করে সামাজিক বিপ্লব" ঘটাতে উপদেশ দেন এইসব গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা তারই প্রতিধ্বনি করে বলেন—বিপ্লব! সে যে অত্যন্ত authoritarian thing! তাতে শ্রেণী ডিকটেটরী প্রতিষ্ঠিত হবে। বিপ্লব চাই তবে ওপথে নয়। Revolution by persuation বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিপ্লব করতে হবে। এই মত পরে ব্লুম সাহেবের হাতে পড়ে উন্নীত হয় Revolution by permission, ধনিক শ্রেণীর অনুমোদনক্রমে বিপ্লব করতে হবে। এর পর আর সন্দেহ থাকতে পারে না ধনিক রাষ্ট্রকে বল প্রয়োগে উৎখাত করা বিষয়ে মনোভাবে।

তারপর রায়সাহেবের মত হল বর্তমান সময়ের লড়ায়ে "Overwhelming majority of peope"র "Common interest" আছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে একচেটে পুঁজিবাদের যুগে ছোটখাট পুঁজিপতিদের একচেটে পুঁজিবাদ বিরোধী ভূমিকা আছে। কিন্তু তাই বলে তাদের বিরুদ্ধতা, মধ্যবিত্ত, চাষী ও শ্রমিকের বিরুদ্ধতাকে এক শ্রেণীর ভাবা, তাদের সকলের সাধারণ স্বার্থ সম্পন্ন ভাবা, মারাত্মকভাবে ভুল। সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে সর্বহারা এবং তার পার্টির ভূমিকা কি হবে এই প্রশ্নে ১৯০২ সালে কমরেড লেনিন, প্লেখানভ ও জাসুলিচের খসড়ার বিরুদ্ধতা করে লেখেন—"একথা ঠিক যে মেহনতকারী এবং শোষিত জনতার মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে চলেছে কিন্তু (প্লেখানভের খসড়ায়) যে ভাবে সর্বহারার বিক্ষোভ আর ছোট ছোট উৎপাদকের অসন্তোষকে এক করে দেখান হয়েছে তা একেবারে ভুল। ছোট ছোট উৎপাদকের অসন্তোষ থেকে আংশিকক্ষেত্রে জন্ম নেয় (জন্ম দিতে বাধ্য) ছোট উৎপাদক হিসেবে তার অস্তিত্বকে বজায় রাখার ইচ্ছা, যার অর্থ হচ্ছে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিকে বজায় রাখা, এমন কি সমাজব্যবস্থাকে আরও পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া" (Collected works-vol VI Pages 32-33)। এই ভাবে জনতার সাধারণ স্রোতে সর্বহারাকে মিশিয়ে দেবার এবং অবিচল বিপ্লবী শ্রেণী হিসেবে সর্বহারার অগ্রনী ভূমিকাকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য বিপ্লবী শক্তিকে দুর্বল করা, বিপ্লবকে বিপ্লবীনেতৃত্বহীন করার ষড়যন্ত্র করা। নয়া মানবতাবাদ তাই করার চেষ্টা করছে।

নয়া মানবতাবাদের লক্ষ্য Class dictatorship নয় কারণ "In this new phase of revolutionary Struggle to work on the principle of class dictatorship is...inadequate" এবং তাই বিপ্লবের পন্থা হবে radical democratic পন্থা যা "that is democracy not only as the ultimate end but democracy in the means and methods as well। রায়মশাই গণতন্ত্রের মহিমা প্রচারে ব্যস্ত, গণতন্ত্র তাঁর কাছে স্বর্গীয় ব্যাপার। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাস্য শ্রেণী বিভক্ত সমাজে গণতন্ত্রটা কি শ্রেণী গণতন্ত্র না হয়ে পারে? সামাজিক ইতিহাসের যে কোন ছাত্রই জানে "যেখানে এবং যখনই সমাজের মধ্যে শ্রেণী বিভেদ ফুটে উঠেছে, মানুষ আলাদা আলাদা গোষ্ঠি হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে কোনও কোনওটি অন্যদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়েছে, অর্থাৎ কিছুলোক অন্য সকলকে শোষণ করছে, ঠিক সেই সময়ে দেখা যায় রাষ্ট্রের জন্ম, জনসাধারণকে দমন করার একটা বিশেষ যন্ত্র হিসেবে।" (১৯১৯ সালে লেনিনের সেরদ্‌লভ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা)। সুতরাং "রাষ্ট্র সমস্ত শ্রেনী স্বার্থের উর্দ্ধে এক সংগঠন" এই চিন্তা ভুল; রাষ্ট্র হল শ্রেণী শাসনের যন্ত্র এক শ্রেণী কর্তৃক অন্য শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার হাতিয়ার। তাই সাধারণতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র-রাষ্ট্রের যে কোন রূপই হোক না কেন মূলতঃ তা কোন না কোন শ্রেণীর একনায়কত্ব। আর যখন যে শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত তখন সেই রাষ্ট্রে সেই শ্রেণীরই গণতন্ত্র থাকে অন্য শ্রেণীর নয়। দাস সমাজের মধ্যে কোনও কোনও রাষ্ট্র হয়ত সাধারণ তন্ত্র বা গণতন্ত্র দিল, কোনটিতে বা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই গণতন্ত্র ছিল শাসক শ্রেণীর, অর্থাৎ দাস প্রভুদের গণতন্ত্র দাসদের নয়। দাসদের তখন মানুষের মধ্যেই গণ্য করা হত না, সমাজে বা রাষ্ট্রে তাদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হত না। নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকারই ছিল না এমন কি মানুষ হিসেবেই তাদের ধরা হত না। তারপর এল সামন্ত যুগ; সেখানে দেখা গেল পুরান দাসের জায়গা নিয়েছে ভূমিদাস। মানুষ হিসেবে এদের অস্তিত্ব তখন মানা হল কিন্তু জমিদারের জমি ছেড়ে যাবার তার অধিকার ছিল না। সামন্ত তন্ত্রে জমিদার হল সর্বেসর্ব্বা, জমিদার শ্রেণীর স্বার্থেই সমাজ ব্যবস্থা চালিত হত। জমিদারের জমিতে ভূমিদাসকে খাটতে হত, খাজনার বদলে তাকে শ্রমদিতে হত এবং সমস্ত কিছু আইন কানুন, ভূমিদাসের অধিকার প্রভৃতি নির্ভর করত জমিদারের ওপর। সামন্ত যুগে কোথাও রাজতন্ত্র কোথাও সাধারণ তন্ত্র বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু এর কোথাও ভূমিদাসদের গণতন্ত্র স্বীকৃত হয়নি। তারপর সমাজের মালিক যখন হল ধনিক বা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী তখন সামন্ততন্ত্র খতম করে তার জায়গা দখল করল বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র। সামন্ততান্ত্রিক আইনকানুন ধনতন্ত্রের শিল্প প্রসারের বাধা সৃষ্টি করছিল; ভূমিদাসকে জমিদারের জমিতে আটকিয়ে রেখে শিল্প বিস্তারের অন্তরায় ঘটাচ্ছিল। ধনিক শ্রেণী তাই চেষ্টা করল সামন্ততন্ত্রকে ভেঙে ফেলে ভুমিদাসকে কারখানা শ্রমিকে পরিণত করতে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী নিয়ে সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তি দেবার আশ্বাস দিয়ে ধনিকশ্রেণী কৃষকশ্রেণীকে হাত করল। কৃষকশ্রেণীও মুক্তি চাচ্ছিল; সুতরাং তারা বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বে বিপ্লবে নেমে পড়ল। সামন্ততন্ত্র ধ্বংস হল, নতুনরাষ্ট্র বুর্জ্জোয়ারা খাড়া করল। দেখা দিল স্বাধীন নাগরিক; প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও প্রত্যেকের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হল। কিন্তু এই স্বাধীনতাও কাগজে পত্তরে বাঁধা পড়ল, মজুরী দাসত্বে বেঁধে কাগজে দেওয়া স্বাধীনতা কার্য্যতঃ কেড়ে নেওয়া হল। আপাতদৃষ্টিতে বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র মনে হয়, কোন শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসেবে একে বোঝা যায় না। প্রত্যেকের ভোট দেবার অধিকার, আইনের বিচারে সকলেই সমান, কোন লোককে আইনগতভাবে রাষ্ট্রের কোন পদ বা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় না, যে যার নিজস্ব সম্পদ সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে, কারও স্বাধীন মতামতে হস্তক্ষেপ করা হবে না—এই সব কথা বলে ধনিকশ্রেণী জাহির করছে তারা প্রকৃত গণতন্ত্রের রক্ষক। কিন্তু আইনগত এই সব অধিকার কার্য্যতঃ জনসাধারণ কতটুকু ভোগ করতে পারে? একটুকু বিবেচনা করলে তার ফাঁকি নজরে পড়বে। "এই গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ; কাজেই এই গণতন্ত্র বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব্বদাই সংখ্যা লঘিষ্টদের জন্য, অর্থাৎ একমাত্র মালিকশ্রেণী, একমাত্র ধনিকদের জন্যই এই গণতন্ত্র। প্রাচীন গ্রীক সাধারণতন্ত্রে স্বাধীনতা যেমন ছিল শুধু দাসপ্রভুদেরই স্বাধীনতা, পুঁজিবাদী সমাজেও স্বাধীনতা ঠিক তেমনই। পুজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার দৌলতে আধুনিক কালের মজুরীদাসেরা অভাবে ও দারিদ্র্যে এত বেশী নিষ্পেষিত যে 'গণতন্ত্র তাদের কাছ কিছুই নয়, রাজনীতি তাদের কাছে কিছুই নয়;' শান্তিপুর্ণ সাধারণ অবস্থায় জনসাধারণের বেশীর ভাগই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ হতে বঞ্চিত থাকে" (রাষ্ট্র ও বিপ্লব)—কমরেড লেনিনের এই মন্তব্য একবারে খাঁটি সত্য। তাই রায়মশাই যে গণতন্ত্রের মহিমায় আচ্ছন্ন তা বড়লোকদের জন্যই; গরীবের তাতে ভাগ নেই। গণতন্ত্রের নামে যা চলছে তা হল পুঁজিবাদী শ্রেণীর একনায়কত্ব। আবার পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তখন যে গণতন্ত্র হবে তা হবে সর্ব্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব। এ একনায়কত্বের মানে হল শোষিত শ্রেণীর জন্য গণতন্ত্র আর প্রতিক্রিয়াশীল শোষক শ্রেণীর ওপর এক নায়কত্ব। সুতরাং

(শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়)

পুঁজিপতিদের দালালরাই বলে

কম্যুনিষ্ট পার্টির আবার দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতিগ্রহণ

তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ

বিরুদ্ধে ডাম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে—অবস্থাপন্ন চাষীর হাতে, এখানেও তেমনি হবে। ধনী চাষীর স্বার্থে বলি দেওয়া হয়েছে মধ্য ও গরীব চাষীর স্বার্থ চাষার ঐক্যবদ্ধতার অজুহাতে।

তারপর শুধু তাই নয়, পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যেও এই রকম ভাগ করা হয়েছে। লড়াই হবে বড় বড় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে টাটা বিড়লার বিরুদ্ধে। এতে বোঝা যায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টপার্টি মনে করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যুগে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর যে সংস্কারবাদী বিরুদ্ধ ভূমিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তা কেবলমাত্র টাটা বিড়লার মত বড় বড় পুঁজিপতিদের অন্তর্হিত হয়েছে অন্যান্য পুঁজিপতিদের আছে। এবং যেহেতু ধনিক শ্রেণীর একাংশের এখনও বিরুদ্ধভূমিকা আছে সুতরাং তাদের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে হবে। এই সর্বনাশাকর চিন্তা কংগ্রেসের একাংশের সহিত সহযোগিতার প্রশ্ন পর্য্যন্ত যেতে বাধা। আর তখন কমরেড যোশীর মতের প্রতিধ্বনি উঠবে—"নেহেরুকে সমর্থন কর কারণ তিনি প্যাটেলের চেয়ে প্রগতিবাদী।" এসব হল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ। কয়েকমাস আগেও কমরেড রণদিভে একে সুবিধাবাদ বোলেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের স্মরণ করিয়ে দেই—তাঁদের অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—"The Andhra Secretariat……declaed that only the big bourgeoisie has gone Collaborationist.……this pseudo-Class analysis……would have had the political consequence of returning to the Mountbatten Resolution, for it means only Tatas and Birlas are no longer oppositional, the remaining Section of the bourgeoisie was still oppositional" (Communist No 4, 1949)। সেই সংস্কারবাদী ভুল পথ কমুনিষ্টপার্টির বর্ত্তমান নেতৃত্ব আবার নিলেন। অর্থাৎ আবার ডানদিকে মুখ ফিরল। আমরা অবাক হব না যদি আবার শীঘ্র শুনি—"Support Nehru because he is the Champion of Indian democracy" কিংবা চক্ষু লজ্জার খাতিরে পণ্ডিত নেহেরুর নাম করতে বাধলে অন্য কোন কংগ্রেস নেতা না হলে জয়প্রকাশের প্রশংসা চলবে।

দক্ষিণ পন্থী বিচ্যুতি দেখা দিতে আরম্ভ করার সঙ্গে তার কোপও পড়ছে ভালভাবে সাধারণ কর্মীর ওপর। সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতা জেলা কমিটিকে খারিজ করা হয়েছে তাঁদের অতি বিপ্লবী কর্মপন্থার জন্যে। তাঁরা নাকি সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সংগ্রামে তত জোর না দিয়ে দেশীয় বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রধানতঃ সংগ্রাম চালিয়েছেন যার ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যাদের সাহায্য পাওয়া যেত তাদের হারাতে হয়েছে—এই হল দক্ষিণ কলকাতার জেলা কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ; অথচ কমরেড রণদিভে নেতৃত্বই দুদিন আগে লিখেছিলেন—"The fight for revolution, therefore, breaks out directly against the Congress Government—and no amount of Curses and abuses againsv imperialism can alter the fact (Communist 4, 1949) যদি দোষ কারও হয়ে থাকে তাহলে তা নেতৃত্বের; অথচ নেতৃত্ব কায়েম রাখার জন্যে দোষ চাপান হচ্ছে সাধারণ কমিটি বা কর্মীদের ওপর। দলকে purge করে সবল করার নামে চলেছে Clique, উপদলীয় ষড়যন্ত্র। যোশী সংস্কারবাদী নিঃসন্দেহে। কিন্তু রণদিভে চক্র যদি যোশীর সেই সংস্কারবাদী চিন্তা একদিকে গ্রহণ করেন এবং অন্যদিকে দলের মধ্যে যারা রণদিভের সহিত একমত হতে পারেন নি তাদের সংস্কারবাদী বলে তাড়িয়ে দেন তাহলে তাকে কি বলে? তাকে বলে Clique করে নেতৃত্ব কায়েম রাখা; তাতে দল বাঁচুক আর মরুক। এই কথা এখন পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। যোশীর সুবিধাবাদী চিন্তাধারা আবার কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্ব মেনে নিলেন কিন্তু দলকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ করার পর, অর্থাৎ দলকে ধ্বংস করে। দলকে সংস্কারবাদের হাত হতে বাঁচাতে হলে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান হল প্রধান কাজ অথচ তা না করে চলেছে ব্যক্তিগত গালাগাল। যেমন "C. I. D. Bosses to 'build' Tito party out of Joshi Renegades" (Cross road 7th April 50)। এর ভিত্তি হল Capitalist Press এর বক্তব্য। যোশীনেতৃত্ব যেমন ভুল করেছিল রণদিভে নেতৃত্বও তার চেয়ে কম ভূল করেনি বা বর্ত্তমানে করছে না। সুতরাং যোশীর Group এর বেলায় যা প্রয়োজ্য রণদিভের চক্রের বেলায়, তা কেন প্রয়োজ্য হবে না? হবে না যেহেতু উপদলীয় চক্রান্ত দলের চিন্তাকে কলুষিত করেছে, মার্কসবাদী চিন্তার ব্যাহিক দেখানাইটাও এখন বিসর্জিত হয়েছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের কাছে আমাদের বক্তব্য আর কতদিন তাঁরা এ অবস্থা চলতে দেবেন। এখনও কি বোঝার সময় হয়নি-ভুল পথে দল গড়ে ওঠার ফলে বর্ত্তমানে দল যে অবস্থায় এসেছে তাতে তাকে শুধরে খাঁটী সাম্যবাদী দল গোড়ে তোলা অসম্ভব। দল জন্মথেকে বড় হয়ে উঠছে যান্ত্রিক একেন্দ্রী করণের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে নয়। তাই সমস্ত rank and file অন্ধভাবে দলের ভুল নেতৃত্ব মেনে নিয়ে ভুল পথে চলেন, আবার নেতৃত্ব আগের ভুল আত্মসমালোচনার নামে একতরফা সমালোচনা করে আত্ম প্রসাদ অনুভব করে যখনই নতুন এক ভুল পথে চলতে থাকে তখন সাধারণ কর্মীরাও সেই ভুল পথে চলেন। কোন বিপ্লবী দলের পক্ষে এ জিনিষ হয় না। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া অন্য কোন কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসেও এ কলঙ্ক নেই। দলের বর্ত্তমান অবস্থা কি খোঁজ নিলে দেখবেন, তা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে, ভুলের বন্যায় দল পচে গিয়েছে। ভারতবর্ষে খাঁটী সাম্যবাদী আন্দোলন ও প্রকৃত কমুনিষ্ট পার্টি গড়ার জন্যে সেই পচা গলিত স্তুপকে ধ্বংস করে নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করা ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার তা করে চলেছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের আমরা আহ্বান করি তাঁরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারকে শক্তিশালী করে ভারতবর্ষের খাটী সাম্যবাদী আন্দোলনকে জোরদার করে তুলুন।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

totalitarianism বলে এখন যদি রায়-সাহেবের আঁতকে উঠতে না হয় তাহলে তখন ত আরও কারণ থাকবে না কারণ এখনকার শতকরা ১জনের গণতন্ত্র তখন শতকরা ৯৯ জনের গণতন্ত্রে পরিণত হবে। তাই "To Speak of democracy in general is nonsense and only the bourgeois hirelings can speak of it" (Domocracy and marxism Com Shibdas Ghosh) এই কথার যুক্তিযুক্ততা ও সত্যতা দিয়ে বিচার করলে বুঝতে কষ্ট হয় না রায় সাহেব কোন শ্রেণীর তাঁবেদারী করছেন।

সর্ব্বশেষে রায়মশাইদের চেষ্টায় যদি কোন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তা হবে "The new state will be democratic in its Composition as well as functioning" (Thc philosophy of Radicalilm-Shib Narayan Rai) রাষ্ট্র গঠনে এবং সম্পাদনে গণতান্ত্রিক হবে। তা নয় বোঝা গেল। কিন্তু ঐ গণতন্ত্রটা কোন জাতীয় হবে? রাষ্ট্র কার স্বার্থ রক্ষা করবে? তার উত্তর হল—"……functions of the Peoples State… should be in keeping with the principles on which the said committees (peoples committees-লেখক) are being run" গণ কমিটির নীতি অনুযায়ীই গণরাষ্ট্র চালিত হবে। গণকমিটির নীতি কি? "This will exclude only the small body of local vested interest, i. e., the bigger land lords, or big financars or big private traders etc., and the bigger fries in the bureaucratic machinery" (ঐ বই)। শুধু বড় বড় জমিদার, বড় পুঁজিপতি, বড় ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, আমলাতন্ত্রের চাঁইদের বাদ দেওয়া হবে। সুতরাং মাঝারী ও ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী চাষী, মাঝারী ও ছোট পুঁজিপতি, সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ব্যবসা করে না এমন সব Joint Stock Companyর খাস্ত পরিচালকেরা এবং প্রায় গোটা আমলাতন্ত্রই কায়েম থাকবে। এদের সঙ্গে শ্রমিক, গরীব ও মাঝারী চাষী ও বুদ্ধিজীবি অংশকে জুড়ে দেওয়া হবে। এদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা হবে গণকমিটির নীতি ও ভিত্তি। তাহলে বোঝা যাচ্ছে রায়মশাই গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেছেন? বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রের গোড়ার কথা হল ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা। তাতে রায়মশাই হাত দেবেন না কারণ তাতে হাত দিতে গেলে agreement হতেই পারবে না। আর তার ওপর নীতি যখন হল এদের মধ্যে "the minimal principles of equitable democraric social life"র ভিত্তি তখন ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের ন্যূনতম অধিকার দাঁড়াবে ধনীর বেলা গরীবকে শোষণ করা আর গরীবের বেলা নির্ব্বিবাদে শোষিত হওয়া। ইংলণ্ডে যে মিশ্র অর্থনীতি চলেছে তার একটু আধটু হেরফের হল নয়ামানবতাবাদের রাষ্ট্রের লক্ষ্য। এবং এই কারণেই ত রায়মশাইএর দল বৃটীশ লেবার নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কিন্তু বিপদ হয়েছে রায়মশাইদের। আজকের দিনে জনতা আগের মতন অতটা বোকা নেই যে, পণ্ডিত দেখলেই তার কথাকে শীরোধার্য্য করবে। তাই সব মত বাজিয়ে নিতে চায়। আর চায় বলেই বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা ফুরিয়ে এসেছে। যতই না কেন ধনিক শ্রেণীর জয়ঢাকগিরি করা হোক, যতই না সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হোক ধনতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য এবং সাম্যবাদের জয় নিশ্চিৎ। আর শ্রমিক শ্রেণী ক্ষমতা হাতে পেলে এইসব মহান গণতন্ত্রীদের থাকার ভাল ব্যবস্থাই করবে।

এবারের মে দিবসের জঙ্গী ডাক—

শ্রমিক শ্রেণী এক হও ★ কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে খতম কর

লেখক—দুর্গা মুখার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য

১লা মে, ১৮৮৭ সাল। ইতিহাস মোড় ফিরল। এতদিনের ইতিহাস ছিল নিশ্চিন্ত শোষণের। নির্লিপ্ত সরল মানুষকে বেকায়দায় ফেলে জুতে দেওয়া হত মুনাফা লোটার কলে। ভ্যাম্পায়ারের মত ধীরে ধীরে মানুষের রক্ত শুষে ছোবড়া করে ফেলে দেওয়াই ছিল এত দিনের ইতিহাসের ধারা। কিন্তু, ঐ দিনটিতে আমেরিকার হে মার্কেটের নিরুপদ্রবী মানুষগুলোর ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে গেল। ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত ছিটকে ওদের বাঁকা কোমর সটান হয়ে উঠল। ওরা মানবে না, মানবে না আর ঐ বাঁধনকে। নির্জীব মানুষ জীবনের সন্ধান পেয়েছে। ওরা অবাধ্য হয়েছে মালিকের। ওরা বাঁচবে, ওদের বাঁচতে হবে। তাই ওরা লড়ায়ে নামছে, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করবে পুঁজিব্যবস্থাকে—এই ওদের শপথ। নিরস্ত্র জঙ্গী প্রাণ আমেরিকার পথে নেমেছে। কংক্রীটের রাজপথ মজুরের কঠিন পদাঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ওরা নিরস্ত্র, তবু ওদের শাণিত—তলোয়ার ইস্পাতের মত ওদের মজবুত ধারালো একতা। চিমসে শরীরে শক্তি ওদের মৃত্যু-পণ শপথ। পুঁজিবাদী শ্রেণী সেদিন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি সে টের পেয়েছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে—সে বোধ করেছে। সে জানে নিরীহ মানুষ ক্ষেপলে কোণ-ঠাসা বেড়ালের মত হিংস্র হয়ে ওঠে। তাই পুঁজিবাদী শ্রেণী মেহনতী জনতার আন্দোলনকে বরদাস্ত করে না, করতে পারে না। সেদিন আমেরিকার মালিক তাই রণসজ্জায় সেজে পথরোধ করেছিল দাবী নিয়ে এগিয়ে আসা নিরস্ত্র মজুরের জমাট মিছিলকে। নিরীহ মানুষের রক্তে কালো পথ লালে লাল হয়ে উঠেছিল। তাজা খুনের উত্তাপে ভাপসা হয়ে উঠেছিল আবহাওয়া। সেদিনের রক্ত রাঙা পতাকাকে আকাশের বুকে তুলে ধরবার' যে শপথ সেদিন আমেরিকার শোষিত মানুষ নিয়েছিল, তা আজ মাঝপথে। বাঁধন-ছেঁড়ার যে পথের ইসারা সেদিন তারা দিয়ে গেছে রক্তের চিহ্ন দিয়ে, সে পথে পৃথিবীর শোষিত, অবহেলিত মানুষ অনেকদূর এগিয়ে এসেছে বিপ্লবী সোবিয়েত আর লাল চীনের নেতৃত্বে। তবু, সেদিনের হে মার্কেটের বিদ্রোহী মজুরের সুরু করা যাত্রা আজও শেষ হয়নি। কেননা, তাদের সেদিনের শপথ আজও পূর্ণ হয়নি—পৃথিবীর বুক থেকে পুঁজিবাদী শ্রেণীর উচ্ছেদ হয়নি। আজও ভূগোলের আধখানা জুড়ে ওদের রাজত্ব কায়েম রয়েছে—হোক্‌ তা ধ্বংসমুখ। তাকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত হে মার্কেটের পথেই চলতে হবে। তাই, ১লা মে আজ সন তারিখের লৌকিক আচার নয়। আজ তা বাঁচবার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করবার, লড়াযে নতুন করে শপথ নেওয়ার তারিখ—তাই ত' ১লা মে জঙ্গী চাষী-মজুর আর জীবন পণ বিপ্লবীর দেওয়াল-পাঞ্জীর টকটকে লাল তারিখ। এ তারিখের ঐতিহাসিক মূল্য শুধু বিশেষ কোন ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এর মূল্য সর্ব্বকালের সর্ব্বদেশের সর্ব্বহারার কাছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বহারার কাছে তাই এ দিন সমান মূল্যবান।

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোবিয়েতের লাল ফৌজ ছিনিয়ে নিয়ে এল পূর্ব্ব-ইউরোপের ছোট ছোট দেশ-গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী জোয়াল থেকে—স্বাধীন করে দিল তাদের। প্রাণের পিয়াসী চীনে সংগ্রামী মানুষের লড়াই শেষ হল। সারা চীন আজ মুক্ত এলাকা। ধনতন্ত্রের গাঁথুনির আধখানা খসে গেল। এদিকে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বিদেশী শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে দেশজোড়া সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। ভারতবর্ষে ২৯ শে জুলায়ের সাধারণ ধর্ম্মঘট সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করে গেল। পুঁজিবাদী শ্রেণী দেয়ালের গায়ে অদৃশ্য হাতের লেখা পড়ল—ওরা বুঝল ভারতবর্ষের মাটী কাঁপছে, সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করল বলে। ওদিকে, যুদ্ধের প্যাঁচে ক্ষয় হয় পৃথিবী জোড়া ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মার্কিন একচেটে পুঁজির আওতায় সে চলে গেল—দেনার দায়ে মাথার চুল সে বিকিয়ে দিল। ঘয়ে যাব ভাঙ্গন ধরেছে, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে বসে চল্লিশ কোটি ভুখা মানুষের মিছিলকে ঠেকাবার শক্তি তার ফুরিয়েছে। তাই সে মিতালী করল তার এক গেলাসের ইয়ার দেশী পুঁজিবাদের সাথে। সাতচাল্লিশের পনেরই আগষ্ট দেশী পুঁজিপতি শ্রেণী হাত পেতে গ্রহণ করল শাসনের হাতিয়ার ইংরেজের তৈরী রাষ্ট্রযন্ত্রটি আর প্রতিশ্রুতি দিল শোষণের।

কিন্তু তাতেও আত্মরক্ষা ওদের সম্ভব হচ্ছে না। পুঁজিপতির নিজের তৈরী অর্থনীতিতে রয়ে গেছে ওদের মৃত্যুর বীজ। তার অর্থনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বের ঠোকাঠুকিতে ঝরে ঝরে পড়েছে তার কাঠামো। একদিকে ঠেকা দেয়, অপর দিকে বালি ইঁট খসে পড়ে। বেকারী দুর্ভিক্ষ অনাচার ছেয়ে ফেলছে সারা পুঁজিবাদী দেশকে। জিনিষের দাম যাচ্ছে চড়ে, কেনবার ক্ষমতা যাচ্ছে পড়ে। আর মেহনতী মানুষের মোহ ভাঙ্গছে। তারা জোট বাঁধছে শেষ আঘাত হানবার। ঐ ঘুণ শুধু আজ ভারতের পুঁজিবাদেই ধরেনি। এ ঘুণ ছাড়িয়ে পড়েছে পৃথিবী-জোড়া পুঁজিবাদী কাঠামোতে। আর এদের এই ঘুণধরা ভেঙ্গে পড়া কাঠামোকে ভেঙ্গে দিয়ে আবার বিজয় অভিযান চলেছে দেশে দেশে। তাই পুঁজিবাদ সেই অভিযানকে বাধা দেবার জন্যে, মুক্ত মানুষকে আবার দাসত্বে বাঁধার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি গড়ে চলেছে দিকে দিকে ঝড়ের বেগে। এশিয়ার এই প্রস্তুতির নেতৃত্ব নিয়েছে ভারতের পুঁজিবাদ। তাই তার বাজেটের ৫১ ভাগ ব্যয় হয় সৈন্য বাড়াবার খাতে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে চায় দেশের মেহনতী মানুষের কোমর ভেঙ্গে দিতে। খেটে খাওয়া মানুষ যাতে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে না পারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, তাই তার গণ-পরিষদে শ্রমিক-বিরোধী লেবর বিল আইন বলে ঘোষণা করে। সমস্ত মজুর আন্দোলনের গলা টিপে মেরে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী মেহেনতী মানুষকে জুতে দিতে চায় সাম্যবিরোধী এই যুদ্ধ চাকায়। নিরুপদ্রবী জনতার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চায় আর একটি যুদ্ধ বোঝা।

এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসেছে সোবিয়েতের শান্তিপ্রিয় মানুষ। তার সঙ্গে আছে নয়াগণতন্ত্রের মুক্ত জনতা। পৃথিবী-জোড়া তাদের সাথী দুনিয়ার মজুরকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিয়ে তারা এগিয়ে আসছে। তবু শুধু তাদের চেষ্টাতেই মেহেনতী মানুষের মুক্তির চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। দেশে দেশে আজ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভারতবর্ষের মেহনতী জনতার দায়িত্বও আজ কোন অংশে কম নয়। তাকে যদি বাঁচতে হয় ত তাকে ব্যর্থ করতে হবে এই যুদ্ধ চক্রান্তকে—সমাজতন্ত্রের লড়াইকে মজবুত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজ তাই সারা ভারতের সমস্ত মজুরকে এক হতে হবে, মিলিতকণ্ঠের বজ্র-আওয়াজ তুলতে হবে শোষণের বিরুদ্ধে। হে মার্কেটের মজুররা সেদিন যে যাত্রা সুরু করেছিল তার পুষ্টি হবে মিলিত সর্ব্বহারার সমাজ তন্ত্রের লড়ায়ে। এ বছরেঃ ১লা মে তাই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ডাক দিচ্ছে সমস্ত সর্ব্বহারাকে, শান্তিপ্রিয় মানুষকে এস, ইউ, সির লাল পতাকার নীচে একতাবদ্ধ হতে, সমাজতন্ত্রের লড়াইকে মজবুত করতে, নতুন করে বিপ্লবের শপথ নিতে। এ কথা আজ ঠিক, তথাকথিত শ্রমিক দরদী জয়প্রকাশী সোস্যালিষ্ট পার্টি, তার মজুর সংঘ হিন্দ-মজদুর সভার নেতৃত্ব এ-ডাকে সাড়া দেবে না। তারা যে পুঁজিপতি শ্রেণীরই দোসর। একথা আজ সর্ব্বহারাকে বুঝতে হবে, বোঝাতে হবে। হিন্দ-মজদুর সভার নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে, তার বাধাকে অমান্য করে, সর্ব্বহারাকে সাড়া দিতে হবে এ মহা-মিলনের ডাকে। পুঁজিপতি শ্রেণীর বাঁ হাত ঐ 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীদের' নেতৃত্ব থেকে ছিনিয়ে নামিয়ে আনতে হবে হতাশ সর্ব্বহারাকে লড়ায়ের খাতে—এ কর্ত্তব্য আজ জঙ্গী মানুষের। এ কাজ সফল করার শপথ নিতে হবে আজ—১লা মে তারিখে!

মধ্যবিত্তকে বাঁচতে হলে শ্রমিক চাষীর সঙ্গে এক

লেখক—রবি বোস

সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই বাজারের ঝোলা আর রেশনের থোলেটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হয়, ভয় হয় বুঝি বা দেরী হয়ে গেল। বাবাঃ বাজার করা নয় ত যেন লড়াই করা—গাঁটে করে যা নিয়ে যাওয়া যায় তা দিয়ে যদি যা দরকার তার সিকি কেনা যায়। তবুও কিনতে হবে এমন কি ধারেও কারণ সংসার ত শুনবে না, সমাজে.ত মুখ রাখতে হবে। মনে হয় মাঝে মাঝে সব ছেড়ে বনে চলে গেলে বাঁচা যায়। জিনিষপত্রের দাম শুনলে মরা লোকেরই রাগ হয়; low blood pressureএর রুগীও বাজারে এলে তার রক্তের চাপ high না হয়ে যায় না। ডাক্তার উপদেশ দিয়েছে রক্তের চাপ নেমে গিয়েছে, দুধ, ঘি, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস খেতে হবে। হুঁ, খেতে আর হয় না; দাম শুনলেই রক্ত মাথায় চড়ে, চাপ বেড়ে যায়। তার কি চাই একটু জিরিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করার উপায় আছে? রেশনের দোকানের লাইনে আবার দাঁড়াতে হবে—দেরী হয়ে গেলে বিরাট এক অজগর সাপের মত যে কেউটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে তার শেষ প্রান্তে স্থান হবে। ফলে অফিসের যাবে বেলা হয়ে, শুনতে হবে সাহেবের গালাগালি। সুতরাং ছোটছুট। কিন্তু এ দৌড়ের কি আর শেষ আছে? রেশন নিতে নিতে হল সাড়ে আটটা। কাক স্নান সেরে নাকে মুখে চাড্ডি গুঁজে আবার দে ছুট ট্রাম বাস ধরার উদ্দেশ্যে। দেরী হয়ে গেলে ভিড়ের জন্যে দুটো তিনটে গাড়ী হয় ত ছেড়ে দিতে হবে—তাতে যাব দেরী হয়ে। তাই কোন রকমে বাদুড় ঝোলা অবস্থায় প্রাণ হাতে নিয়ে বাসের মাডগার্ডের ওপর কিংবা ট্রামের ডাণ্ডা ধরে ঝুলতে ঝুলতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে, ধাক্কা খেয়ে পা মাড়ানি সহ্য করে, কিল চড় লাথি গালাগালি হজম করে চলতে হবে। অবশেষে ট্রাম এসে থামলো ডালহাউসি স্কোয়ারে; লাফিয়ে নেমে দে দৌড় অফিসের দিকে। এমনি করে চলেছে দলের পর দল, দিনের পর দিন—যৌবনের প্রারম্ভ হতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত। এদের কেউ চলেছে অফিসে, কেউ আদালতে, কেউ স্কুলে আরও কত হাজার রকমের প্রতিষ্ঠানে। কেউ হল কেরাণী, কেউ হল উকিল মোক্তার, কেউ মাষ্টার, দালাল, আরও কত কি।

এরাই হল তারা যাদের জীবনে দুঃখ আছে, দুর্দ্দশা আছে, বড় বাবু বড় সাহেবের লাথি ঝেঁটা আছে, তবুও আছে গর্ব্ববোধ শিক্ষিত বলে, আছে উন্নাসিকতা শ্রমিক চাষীদের চেয়ে উন্নত ভেবে; খেতে পায় না তবু এরা ভুয়ো সামাজিক ইজ্জত বজায় রাখতে সদাযত্নপর, কচি ছেলে মেয়েদের এক ফোঁটা দুধ দিতে পারে না অথচ আত্মীয় স্বজনের বিয়েতে উপহার দেয় নিজের খাবারের খরচ কেটে। এ হেন যে হতভাগ্যের দল তাদেরই বলে মধ্যবিত্ত। কিন্তু এদের মধ্য কিনা সন্দেহ তবে চিত্ত এদের মধ্যে দোলে। তাই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন এরা যেমন দেখে, ধনীর সাহায্যকারী হয়ে যেমন লড়ে তেমনি আবার আঘাত খেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর দলেও আসে। ঘড়ির দোলকের মত দুলছে একবার এদিকে পরমূহুর্ত্তে ওদিকে।

সাম্রাজ্যবাদ এদের জনক

ইংরেজ আসার আগে হিন্দুযুগ হতে আরম্ভ করে মুঘল যুগের শেষ পর্য্যন্ত ভারতের অর্থনীতি ছিল খাটি সামন্ততান্ত্রিক; জমিই ছিল তখন উৎপাদনের একমাত্র উপায়। আর এই জমির মালিকরা কেউ ছিল সামন্ত রাজা, কেউ স্থানীয় শাসন কর্তা, কেউ তশীলদার। এই সামন্ত গোষ্ঠি জমির মালিক হলেও জমির ওপর প্রকৃত মালিকানা ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির; রাজা মহারাজদের খাজনা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হত। জমিকে চাষ বাদ কাজে কিংবা তাকে পণ্য হিসেবে বিক্রী করার তাদের কোন অধিকার ছিল না। গ্রামপঞ্চায়েতগুলির মধ্যে তখন বিপরীত স্বার্থ এসে দেখা দিয়েছে। এই বিরুদ্ধ শক্তির একদিকে ছিল তখনকার সমাজ ব্যবস্থার কায়েমী স্বার্থ সম্পন্ন সামন্ত প্রভুরা অন্যদিকে তৎকালীন অর্থনৈতিক নিয়মে অত্যাচারিতরা। সামন্ততন্ত্রের তখন মুমূর্ষু অবস্থা—একে ত সামাজিক বিরুদ্ধ শক্তি তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছিল, তার ওপর সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি দলাদলীতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মুঘল শাসন কর্ত্তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুঘল সার্বভৌমশক্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দুর্বল করে দিল, মারাঠারা নিশ্চিহ্ন করল মুঘল শাসন কর্ত্তাদের আর তাদের ধ্বংস করল আফগানরা। ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্রের এমনি যখন শেষ অবস্থা তখন গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ভারতের মাটীতে পদার্পণ করল ইংরেজ ব্যবসায়ী দল। বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসার মারফৎ এদেশেও একদল ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে উঠছিল। এদের স্বার্থ পদে পদে বাধা পাচ্ছিল নবাবী অর্থব্যবস্থায়। তাই এদেরকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে চূর্ণ করার চেষ্টায়। জগতশেঠ এদেরই প্রতিনিধি! চতুর ইংরেজ ব্যবসায়ী এদের একত্রিত করে নবাবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাল। এদের সাহায্যে এগিয়ে এল মিরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভের দল—কেউ সিংহাসন পাবার আশায়, কেউ ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে আবার কেউ বা ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা করে মুনাফা লোটার আশায়। নবাব পরাজিত হল। ইংরেজের অস্ত্রের সঙ্গে এল পণ্যের আমদানী রপ্তানী প্রথা। ধনতন্ত্রের আক্রমণ চলল জীর্ণ গ্রামপঞ্চায়েতী কৃষি ব্যবস্থার ওপর। দুর্বল, অনগ্রসর, স্থবির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল আর তারই ধ্বংসস্তুপের ওপর জন্ম নিল নতুন ব্যবস্থা।

সার্বভৌম বৃটীশরাজের নিরাপদ আশ্রয়ে ইংরেজ বণিকরা এখানে অবাধ লুণ্ঠন চালাতে লাগল। ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপ গেল আমূল পালটিয়ে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণীর আমলে বাণিজ্য থেকে ভারতবাসীরা যে ৬ কোটী টাকা লাভ করত তা গেল লোপ পেয়ে, ভারতের তৈরী মালের রপ্তানী বন্ধ হয়ে গিয়ে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ হয়ে উঠল ইংরেজ বণিকদের পণ্যদ্রব্য বিক্রীর বাজার। বণিক স্বার্থে গঠিত ইংরেজরাজ তার বাণিজ্য ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এইসব সহরে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্ম নিল। এরা কেউ কোম্পাণীর আমলে দেওয়ানী করে জমিদারী পেল, কেউ বা আইন সভায় আইনের তর্জমা করে, কেউ বা সরকার বা ব্যবসায়ীর অধীনে কেরাণী গিরি করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগল। এই নব্য মধ্য বত্ত সমাজ পেশার সুবিধার্থে সহর ও সহরের আশেপাশে পত্তনি গাড়ল; সহরে এদের প্রভাব হল সম্পূর্ণ কিন্তু ব্যবসায়ী ইংরেজ এতদিন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে নি; করেছে অবাধ লুণ্ঠন। তারা বুঝল সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে হলে, যে ভারতীয় সাম্রাজ্য তারা গড়ে তুলছে তাকে রক্ষে করতে হয়। আর তার জন্যে দরকার বিরাট এক কেরাণী ও নিপুন কর্মীর বাহিনী। সুতরাং প্রচলন হল ইংরিজী শিক্ষার; ব্যবসার উপযুক্ত কিছু কিছু ইংরিজী শিখিয়ে আর ইংরেজ মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরিজী ইতিহাস পড়িয়ে গোড়ে তোলা হল এক বিরাট কেরাণীর দল। এদের কাজ হল ইংরেজ ব্যবসায়ীর হিসেব রাখা, অফিস চালান, তাকে ভারতবাসীকে লুঠতে সাহায্য করা। তাহলে দেখা গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণী অন্যান্য দেশে যেমন স্বাধীনভাবে জন্ম নিয়েছে ভারতবর্ষে তেমনভাবে নেয়নি, বিদেশী লগ্নিপুঁজির দাসত্বে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে, তার কৃপায় বর্দ্ধিত হয়ে, তার সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে সে।

বর্ত্তমান মধ্যবিত্তের দুর্গতি

এই সব মধ্যবিত্তদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসার মারফৎ প্রচুর লাভ করে চলছিল। এরা প্রথমে বিদেশী বণিকদের সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে লাগল দেশী মূলধনে চালিত দেশী শিল্প কেন্দ্র। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল দেশীয় শিল্পপতি শ্রেণী, জাতীয় বুর্জ্জোয়াশ্রেণী। এদের মূলধন বিস্তৃতিকে ইংরেজ ভাল চোখে দেখে নি কারণ সে জানত ভারতবর্ষের মাটীতে জনসাধারণকে শোষণ করবার বিষয়ে এদের সঙ্গে লড়াই একদিন বাধবে; তাই দেশীয় শিল্প প্রসারের চেষ্টাকে দাবিয়ে রাখার জন্যে বহু বাধা নিষেধ আরোপ সে করেছিল। আবার তার নিজের স্বার্থে কিছু কিছু এদের সে বাড়তেও দিয়েছে নিজের লগ্নি পুঁজির সহায়ক শক্তি হিসেবে। দেশীয় পুঁজিবাদ সবল ইংরেজ লগ্নি পুঁজির অধীনে জন্ম নেওয়ায় কোন দিনই সে বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল না, বিদেশী মূলধনের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে সে বেড়ে উঠতে চাইল। তাই

হতে হবে সমাজতন্ত্রের জন্যে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়তে হবে

জাতীয় আন্দোলনেও এই চিন্তাধারার প্রতিরূপ দেখা দিল। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিপ্লবী-রূপ না নিয়ে নিল সংস্কারবাদী বিরুদ্ধরূপ। তাই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এরা লড়ে কিন্তু যে মূহূর্তে সে লড়াই ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে গিয়েছে তখনই বিপ্লবভীতির জন্যে জাতীয় নেতৃত্ব তাকে থামিয়ে দিয়ে দর দস্তুর করে সুবিধা আদায় করতে চেয়েছে। এমনি করে ধীরে ধীরে দেশীয় পুঁজিবাদ গড়ে উঠছে; ভারতীয় পুঁজিপতির দল সবল হয়ে উঠেছে দেশে শিল্প অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এক একটা শিল্পাঞ্চলকে কেন্দ্র করে হাজারে হাজারে লাখে লাখে মধ্যবিত্তের দল জন্ম নিয়েছে।

এই যে মধ্যবিত্তরা এদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, আর দারিদ্র্য চরম। সম্প্রতি ভারত সরকার ৫০০০ Sample name এর সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসেব পরীক্ষা করে দেখে এই সিদ্ধান্ত করেছে যে এদের একটা মোটা অংশ চিরঋণী। বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর ও মধ্য-প্রদেশে এই ধরণের ঋণী পরিবার হল মোট পরিবারের শতকরা ৮০ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৭৫ ভাগ। গড়ে পরিবার প্রতি মাসিক আয় সরকারী তথ্যমতে ৫৯৷৶০ থেকে ২৮৬৴০ পর্য্যন্ত; একদিকে মাদ্রাজ অন্যপ্রান্তে দিল্লী। কিন্তু একথা কাগজের হিসেব। সরকার ৫০০, টাকা পর্য্যন্ত যাদের আয় তাদের হিসেবে নিয়েছেন কিন্তু ৫০০, টাকা আয় ভারতবর্ষের কতজনের। যদি এই অত্যন্ত স্ফীত গড়ই ধরে নেওয়া হয় অন্য কোন সঠিক অঙ্কের অভাবে তাহলেও মধ্যবিত্তদের দুর্দ্দশার ছবি ঢেকে রাখা যায় না। ঐ হিসেবেই বলা হয়েছে বোম্বাই প্রদেশে পরিবার প্রতি লোক সংখ্যা হল সর্ব্বনিম্ন ৫'৭ জন, আর বিহার উড়িষ্যায় সর্ব্বোচ্চ ৭'৪ জন। এই দুয়ের গড় দাঁড়ায় ৬'১ জন। চারজন নিয়ে যে পরিবার তার বর্ত্তমান খাইখরচ পড়ে কমপক্ষে ১১৭॥৴০, সুতরাং ৬ জনের সংসারে এর দেড়গুণ প্রায় লাগে অর্থাৎ ১৭৬, টাকার মত। তার ওপর মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়ের শতকরা ৭ থেকে ১১ ভাগ কাপড় চোপড়ের, জ্বালানীর বাবদে শতকরা ৩'৮ থেকে ৫'৯ ভাগ, বাড়ীভাড়ায় শতকরা ১২ ভাগের মত এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, যাতায়াত, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, পালপার্ব্বন উৎসব ইত্যাদিতে শতকরা ৩১'৮ ভাগ হতে ৪০'৫ ভাগ পর্য্যন্ত। তাহলে দেখা গেল মোট আয়ের শতকরা ৫৫'৬ ভাগ থেকে ৭০'৪ ভাগ খরচ হয় খাওয়া বাদে। সুতরাং দেনা না হয়ে উপায় নেই। তার ওপর যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল তাদের কথাই এতে ধরা হয়েছে এবং হিসেবটা বলা হয়েছে যখন বেকার সমস্যা এত ভীষণভাবে দেখা দেয়নি। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, প্রফেসার বি. পি. আদরকর সাম্প্রতিক এক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্য্যন্ত Employment Exchange গুলিতে চাকরীর জন্য নাম রেজেষ্ট্রী করিয়েছে ১০ লাখ। আসল সংখ্যা, এর কতগুণ হবে? বড় বড় সহর ছাড়াও বেকার আছে; আর ভারতবর্ষে মোট অঞ্চলের তুলনায় বড় বড় সহরগুলির সংখ্যা চিন্তা করলে সচ্ছন্দে বলা যেতে পারে প্রকৃত সংখ্যা নিদেন পক্ষে এর দুগুণ ত হবেই। এই বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে ক্রমশ। গত বছরের প্রথমার্দ্ধে ১৯৪৮ সালের ঐ সময়ের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ বেকারত্ব বেড়েছে। এ বছর গত বছরের চেয়ে বেশী। এই বেকারের মধ্যে মধ্যবিত্তদের একটা প্রকাণ্ড সংখ্যা আছে। সুতরাং এই বাবু সম্প্রদায়ের এখনকার আয় এবং ক্রমবর্দ্ধমান জিনিষপত্রের দাম যদি বিবেচনায় আনা হয় তাহলে সরকারের দেখান পরিবার প্রতি আয় অর্দ্ধেকে এসে ঠেকে আর খরচ ২ থেকে ৩ গুণ বেড়ে যায়। তার ফল দেখাও যাচ্ছে: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ক্ষয়রোগের দ্রুত প্রসার। দেহ পুষ্টিসাধন ও সংরক্ষণকারী খাদ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার দেখতে পায় কিনা চোখে তাতে সন্দেহ আছে।

কংগ্রেসী শাসন প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গার ইতিহাস

স্বাধীন ভারতে প্রত্যেকে কাজ পাবে একথা মন্ত্রীত্বের গদীতে চড়ার আগে এবং পরেও গোড়ায় গোড়ায় বলা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে Scientific Manpower Committee বলে একটা কমিটি গঠিত হয় ভারতের বৈজ্ঞানিক, ও টেকনিকাল কত লোক লাগবে এবং কেমন করে তা পাওয়া যাবে সেটা ঠিক করার উদ্দেশ্যে। কমিটির findings নীচে তালিকা করে দেওয়া গেল; এ থেকেই বোঝা যাবে সরকার যা বলেছিল তার কি করেছে।

বৃত্তি	মোট চাহিদা	১০ বছরে শিক্ষা দেওয়া হবে	ঘাটতি
ইঞ্জিনিয়ার	১৫,২৩০	×	×
রসায়নবিদ (Chemist)	৬,৫৪৩	৪,৭৯১	১৭৫২
পদার্থবিদ (Physicist)	৩,২৯১	২,০৫০	২৪১
ধাতবশিল্পবিদ (Metallurgist)	১,০৬২	৫৮০	৪৮২
কাঁচ শিল্প (Glass & ceramics)	৩১৫	৩০০	১৫
বয়ন শিল্প (Textiles)	৭৫৬	৩৪০	৪১৬
চমড়া	৩৪৬	১১০	২৩৬
ভূতত্ত্ববিদ (Geologist)	১,৪২০	৪১০	১০
হিসাব বিদ (Statistician)	১,৫৬০	১২.০	৩৫০
উদ্ভিদতত্ত্ববিদ (Botanist)	৮৯৯	৬০৫	২৯৪
কৃষিবিদ (Agricultural scientist)	২,৬৩৬	৮,৭২৬	×
দুগ্ধ ব্যবসা (Dairy)	৬৯৫	১৮০	৫১৫
অন্যান্য	২.১০০	×	×

নতুন লোককে শিক্ষিত করে তুলে ভারতীয় শিল্পকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রমনীতির কল্যাণে ৪০ হাজার পুরাণ "technical personnel" লোক আজ বেকার হয়ে সরকারের Employment Exchangeএর কাছে কর্ম্মপ্রার্থী। চাকরী তারা পায়নি এবং এত টাকা খরচ করে কমিটি যে রায় দিল তাকেও কার্যকরী করার কোন চেষ্টাই নেই। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিদের বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কোন আশা নেই, এই সত্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

মধ্যবিত্ত ও তার চিন্তাধারা

বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এরা যেন উৎক্ষীপ্ত, নেহাৎ আগাছা। চাষী মজুরের মত এরাও উৎপাদনযন্ত্রের অস্ত্র, সমাজ এদের রক্তে গঠিত হলেও সামাজিক কাঠামোতে চাষী আর মজুরের মত এদের স্থান নেই। চিন্তাধারা ও দর্শনের দিক থেকে মধ্যবিত্ত এবং চাষীমজুরের মধ্যে প্রভেদ অসামান্য। গরীব চাষী আর মজুর নিজেদের দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ সম্বন্ধে সচেতন হলে, তাদের শ্রেণী সচেতনতা গড়ে উঠলে তারা এ সমাজকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে চায় যেখানে নিজেদের থাকবে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব কিন্তু মধ্যবিত্ত-শ্রেণী সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনে রাজী নয়, সে জমিদার আর পুঁজিবাদীদের শোষণ সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু চাষী আর মজুরের পাশে দাঁড়িয়ে সে সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়তে রাজী নয়। secured জীবনের আশা তা যত হীনই হোক না কেন, তাকে পেছু টানে; শ্রমিক আর গরীব চাষীর মত বেপরোয়া মনোভাব তার থাকে না। তার ওপর তার ভয় হয়, 'ছোটলোকের দল' ক্ষমতা হাতে পেলে তার সম্ভ্রম থাকবে না, তার সংস্কৃতি তার জীবনবেদ তার যথা সর্ব্বস্ব চলে যাবে। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব সে ভাল নজরে দেখতে পারে না, বেশ একটু ভয়ও করে বুঝিবা। উপরন্তু প্রথম প্রথম সে ভাবতেই পারে না, দুর্ব্বল (তার মতে অবশ্য) অশিক্ষিত 'ছোট লোকের দল' দুর্জয় শক্তিশালী, শিক্ষিত ধনিক শ্রেণীকে হটিয়ে দেবে ক্ষমতার লড়াইয়ে। তাই শ্রমিকের সঙ্গে বিপ্লবী শিবিরে যোগ দেবার ঝুঁকি সে নিতে নারাজ। অথচ শিক্ষা আর সংস্কৃতির জোরে সে বোঝে সমাজ ইতিহাসের ধারা, কিছুতেই মানাতে পারে না পুঁজিবাদীও সামন্ততান্ত্রিক শোষণকে নিজের নীতিবোধের সঙ্গে। তাই বিপ্লবিক পথ ছেড়ে সে খোঁজে সমন্বয়ের পথ। পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে সে চায় না

(১৯শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছাত্র আন্দোলনের বর্ত্তমান ধারা—ঐক্যবদ্ধ

লেখক ঃ—সুকোমল দাসগুপ্ত
সাধারণ সম্পাদক এস, ইউ, সি, ছাত্রব্যুরো

ভারতবর্ষ আজ এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। জনজীবন আর বোঝা সইতে পারছে না। বোঝার পর বোঝা, সমস্যার পর সমস্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভোর থেকে রাত পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটেও এই সমস্যার বোঝা কাটানো আর কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে তার, সহের সীমা হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ধৈর্য্য হারিয়ে প্রতিবাদ করবার পথও আজ রুদ্ধ হতে চলেছে। শোষক যারা তারা ভালভাবেই বোঝে যে শোষিতের দল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে না। তারা প্রতিবাদ করবেই—তারা পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করবেই। তাই শোষণকে যদি পাকাপোক্ত করতে হয়—নিজের প্রভুত্ব যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তার জন্যে কিছু কলা কৌশলের প্রয়োজন। সেই কৌশলগুলিকে সময় মত কাজে লাগানোই তার একমাত্র করণীয়। এ শিক্ষা কোন এক দেশের শোষক শ্রেণীর শিক্ষা নয়, এটা সারা দুনিয়ার শোষক গোষ্ঠীর শিক্ষা। ভারতবর্ষে যারা শোষক দলভুক্ত তারাও এ শিক্ষা হতে বহির্গত নয় বরং সেই সব শিক্ষাকে প্রতিদিনই নূতন থেকে নূতনের উপায়ে কাজে লাগাতে তারা বিশেষ পারদর্শীতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন।

দেশের সংগ্রামী জনসাধারণ গত ষাট বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল একটি আশায়, সে আশা হচ্ছে সত্যিকারের, স্বাধীনতার আশা, মানুষের মত বেঁচে থাকার আশা। কিন্তু সেই আশা আজ পর্য্যন্ত জনগণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি ভারতবর্ষে সঠিক বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে। তারই সুযোগ নিয়েই কংগ্রেসী নেতারা সারা দেশের লোকের স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু জনসাধারণ তার রূপ সহজে যাতে না ধরতে পারে তার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। অজ্ঞ জনসাধারণকে বোঝান হয়েছে যে এতদিনে তাদের স্বাধীনতা মিলল—এই স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য জনগণ ভুল বুঝল—ভাবল যাঁরা দেশের জন্য জেল খেটেছেন, এত অত্যাচার সহ্যকরেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই গরীবের প্রতিনিধি। গরীবের স্বার্থ তাঁরা অবশ্যই দেখবেন। তারা সেদিন বুঝতে, বিচার করতে ভুল করেছিল—বাইরের চোখের ভুল ও আত্মত্যাগকেই তারা স্থান দিয়েছিল সবার উপরে মত ও পথের আলোচনাকে বাদ দিয়ে। এই ভুল শুধু মাত্র জনতা করেছিল বললে ভুল করা হবে জনতার অগ্রগামী অংশ বলে যাঁরা নিজেদের পরিচয় দেন—সমস্ত তথাকথিত বামপন্থীদলগুলোও সেই ভুল করল—জনতাকে ভুল বুঝতে সাহায্য করল। সেই ভুলের মাশুল আজ প্রতি পদে দিতে হচ্ছে। আজ যে কোন নিরপেক্ষ লোকই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে কংগ্রেসী সরকার ধনিক সরকার, ধনীর স্বার্থ দেখাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সেদিনের ভুলের ফলেই এই ধনিক প্রতিভূদের সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের ভিত্তিকে দৃঢ় করতে—তাদের শোষণকে আরোও ভালভাবে চালু করতে।

আজ আমরা যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারের কাহিনী। গরীব জনতা যেখানেই তাদের মূল দাবী, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ও ন্যায্য দাবী নিয়ে এগিয়ে গেছে সেখানেই সরকার চালিয়েছে তার লাঠি, গুলি ও গ্যাস। এই গুলি পড়েছে কারখানার মজুর, গ্রামের চাষী, ছাত্র, মধ্যবিত্তদের ওপর, এমন কি অসহায় নারী ও বাস্তুহারারাও বাদ যায়নি কংগ্রেসী সরকারের এহেন কৃপার হাত থেকে। তাই আমরা দেখছি যে কোন চেষ্টা যেখানে গরীব জনসাধারণ করেছে, সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সরকার কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

প্রথমে ছাত্র আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করলেই দেখব যে একদিন দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল সমাজের এই মধ্যবিত্ত অংশ—ছাত্র সাধারণ। অধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হবার তীব্র আকাঙ্খা সবচেয়ে প্রথমে জাগে এই সব তরুণের মনে। এমন একসময় ছিল যখন ছাত্রদের, তাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করবার কোন সুযোগ ছিল না—যখন তারা সমাজের এক বিশেষ অংশ হিসাবে এগিয়ে আসতে পারে নি। কিন্তু ক্রমেই যখন তাদের অভাব অভিযোগগুলি তাদের সামনে ফুটে উঠতে লাগল, যখন তারা দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে এগিয়ে আসতে লাগল তখন তারা আন্দোলনের মারফৎ তাদের সাধারণ দাবীগুলো প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব্রিটীশ শাসনের পুলিশী কড়াকড়ির ব্যূহকে ভেদ করে তাকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করে ছাত্ররা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাঁদের স্কুলে, কলেজে রাজনীতি করার অধিকার, ইউনিয়ন গড়ার অধিকার—আর এককথায় বলতে গেলে তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করার সুযোগ আদায় করেছিল সেই কুখ্যাত ব্রিটীশ শাসনাধীনে।

ছাত্রদের এই আন্দোলনে দেশের জাতীয় নেতারা তখন স্পৃহা জাগাচ্ছিলেন পেছন থেকে শুধু নিজেদের শ্রেণী স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করবার কাজে এদের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে। ছাত্রদের তাঁরা এই শিক্ষাই দিতেন "Education can wait' but Swaraj cannot" আর অন্যদিকে দেখাতেন ভবিষ্যৎ সমাজের সুখী ছবি। অনেক প্রতিজ্ঞাই সেদিন দেশের নেতারা করেছিলেন; বলেছিলেন, স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে সমস্ত কুশাসন, প্রতিষ্ঠিত হবে জনসাধারণের সত্যিকারের সুখ। কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাই যে নেতাদের সেই সব কথা সবই মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত একটি মূল সমস্যার সমাধান দূরের কথা, বিন্দুমাত্র লাঘব তাঁরা করতে পারেন নি। শিক্ষার কথা যদি বলি তাহলে বলব যে অভূতপূর্ব্ব নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় তাঁরা দিয়ে এসেছেন এই শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে। গরীব জনসাধারণকে বিনামূল্যে মাধ্যমিক না হলেও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিলেন। সেটাতো দূরের কথা—আজ তাঁদের কর্ম্মপন্থার জন্য শিক্ষার ব্যাপকতা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। কিছু দিন আগেও প্রতিটি স্কুল কলেজের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে বর্দ্ধিত মাইনে দিতে অক্ষম তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আশা ইতিমধ্যেই ত্যাগ করেছেন। অথচ শিক্ষকদের মাইনে বাড়ানোও হয়নি জিনিসপত্রের বর্দ্ধিত মূল্যের অনুপাতে। ছেলেদের মাইনে বাড়বে কিন্তু শিক্ষকদের নয়—অর্থাৎ সোজা কথায় বললে স্কুল কলেজগুলি হল অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। লাভ করা এর উদ্দেশ্য।

এই অসহনীয় অসহায় অবস্থায় পড়ে বাংলার নিরীহ শিক্ষক ধর্ম্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছিলেন এই দাবীতে যে, সরকার শিক্ষার বাজেট বাড়িয়ে ছাত্রদের মাইনে কমাবার ও শিক্ষকদের মাইনে বাড়াবার জন্য। কিন্তু এটা আজ স্পষ্টই প্রমাণ হয়েছে যে এই সরকার শিক্ষার প্রসার চায় না। চায় শুধু নিজেদের জঘন্য স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে। তাই শিক্ষা বাজেট বাড়াবার পরিবর্ত্তে তাঁরা ইতিমধ্যেই কমিয়ে দিয়েছেন—পুলিশ ও মিলিটারী বাজেট বাড়াবার বিনিময়ে। শুধু তাই নয় যে শিক্ষকরা তাঁদের ন্যায্য দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে সমস্ত স্কুল-কলেজ সেই প্রতীক ধর্ম্মঘটের ২ দিন (১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর) বন্ধ ছিল, সেটা ধর্ম্মঘট করেই হোক বা অন্য কারণেই হোক তারা যে সরকারী মাগগী ভাতার আর্থিক সাহায্য পেত তা' থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধরণের সিদ্ধান্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই আশ্চর্য্য হবেন সন্দেহ নেই। এটা প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের উপর একটা হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়। ন্যায্য দাবী মেনে নেবার পরিবর্ত্তে ফ্যাসিষ্ট সরকার আজও তীব্র ভাবে আক্রমণ করল এদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

এটা হচ্ছে সরকারী আক্রমণের একদিকে। সরকারী আক্রমণের আর এক দিকের নমুনা দেখেছি ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে। একদিকে যেখানেই ছাত্ররা তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছে, যেখানেই ছাত্রদে অগ্রনী হয়ে যাঁরা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা হয়েছেন বিতাড়িত। অবশ্য এ ব্যাপারেও শিক্ষকরা বাদ যান নি। আর্ট স্কুল, স্কটিশ চার্চ্চ, বঙ্গবাসী, আশুতোষ কলেজের ঘটনাগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শুধু এই বিতাড়নেই তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী সম্প্রতি এক সার্কুলারে জানিয়েছেন পরিষ্কারভাবে যে ছাত্রদের স্কুল কলেজে কোন আন্দোলনে যোগ

ছাত্র আন্দোলন ছাত্রদের বাঁচাতে পারে

দেবার অধিকার থাকবে না। সভা করা পোষ্টার মারা বা কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হবে।

এই সব ঘটনার থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ছাত্র আন্দোলনকে পিষে ফেলতে সরকার আজ বদ্ধপরিকর। দেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এর ভেতরেই তাঁরা বেশ একটা ভাঙ্গন সুরু করেছেন—একদিকে দালাল প্রতিষ্ঠান I. N. T. U. C. ও অন্যদিকে সরকারী নিষ্পেষণের মারফৎ। এই সব আক্রমণে বামপন্থীয় মজুর আন্দোলনকে বেশ কিছুটা ঘায়েল করতে সমর্থও হয়েছেন। এবার তাঁদের নজর পড়েছে এই তরুণদের উপর। ছাত্র আন্দোলনে I. N. T. U, C. অনুকরণ N. U. S. (National Union of Students) এখনও গড়ে ওঠেন, কিন্তু তার চেষ্টা চলোছে। ধনিক শ্রেণী জানে যে এইসব মধ্যবিত্ত যুবকদের বেশীর ভাগের আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির ফলেই আজ তারা গদীতে আসীন। দেশের স্বাধীনতা আন্দালনে এরাই সবচেয়ে বেশী এগিয়ে এসেছিল। এবং এটাও ঠিক যে ১৫ই আগষ্টের নকল স্বাধীনতার ধাপ্পাবাজী সম্পর্কেও এই মধ্যবিত্ত ছাত্রের দল কিছুটা বেশী সচেতন সমাজের অন্যান্য নিম্ন অংশের চাইতে। তাই আজ এই ছাত্রদের আন্দোলনের শক্তির জোয়ারকে ভেঙ্গে দিতে নাপারলে তারা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। এই আক্রমণ শুধু বাংলার ছাত্রদের উপর নয় সমগ্র ভারতের ছাত্র আন্দোলনের উপর নেমে আসছে। বাংলা, বিহার, পাটনা দিল্লী বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও একই ধরণের অত্যাচার চলছে।

কংগ্রেসী সরকার নিঃসন্দেহ ভাবে এই সব আন্দোলনকে পিষে ফেলতে বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই পচাগলা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তনের কথা বাদ দিলেও তাকে সংস্কার করার ব্যাপারে আবার তেমনি নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় তাঁরা দিয়ে এসেছেন। পূর্ব্বেই শিক্ষা বাজেট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সরকারী মহল থেকে বহুদিন ধরে প্রচার করা হয়েছে সরকারী শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারের কথা বাদ দিয়েও কেন না এসব বিভাগের মাইনে দেবার মত ক্ষমতা সাধারণ মধ্যবিত্তের নেই।) সাধারণ বিভাগের স্কুল কলেজের সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা দেশ বিভাগের ফলে বহু সংখ্যক ছাত্র পশ্চিম বাংলায় এসেছে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা যে কিছুদিন আগে কলেজের অধ্যক্ষদের এক সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে কলেজগুলোতে একমাত্র মেধাবী ছাত্র ছাড়া কোন ছাত্র ভর্ত্তি করা হবেনা এবং কোন কলেজেই ১৫০০ ছাত্রের অধিক ছাত্র নেওয়া হবেনা। তার মানে এটা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে একদিকে ছাত্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে পশ্চিমবঙ্গে; কলেজের সংখ্যা সেই অনুপাতে কিছুই বাড়ানো হয়নি। এই অবস্থায় ছাত্র সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করে দিলে একটা বিরাট অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আর মেধাবী ছাত্র সম্পর্কেও একথা পরিষ্কার যে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাথে আত্মীয়তাই মেধার পরিচয় সেখানে গরীব মধ্যবিত্ত ছেলে তাঁদের মেধাবী বলে কি করে পরিচয় দেবে? বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় এই ধরণের অত্যাচার কেন আসছে। সরকার আজ দেশের লোককে উপযুক্ত কাজের সুযোগ দিতে পারছে না একটা বিরাট অংশ আজ বেকার হয়ে বসে আছে। তাই যাতে বেশী ছেলে প্রতি-বছর পাশ করে বেরিয়ে এসে চাকুরী দাবী করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই ছাত্রের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। বেকারী সমস্যাকে সমাধান করবার জন্য উপযুক্ত শিল্প গড়ে তোলবার অক্ষমতাকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা ছাত্র ছাঁটাই নীতির ভেতর দিয়ে। কিন্তু এসব কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে কিংবা আন্দোলন করতে হলে একটা বিরাট বাধা আমাদের সামনে আসে—সেটা হচ্ছে আজকের দিনের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা। উভয় বঙ্গের সরকারই জনসাধারণের মূল সমস্যার সমাধান না করতে পেরে জনতাকে আন্দোলন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়েছে আর অজ্ঞ জনতাও মেতে উঠেছে, কলুষিত হয়েছে এই বিষে। আর সব সমস্যার আগে এসে দাঁড়িয়েছে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা। আজকে অন্যান্য সমস্যার কথা জনতা ভুলতে চলেছে ক্ষণিকের জন্য। ধনিক গোষ্ঠির চাল খুব ভাল ভাবে কাজে লেগেছে তাদের স্বার্থে।

একদিকে নিরঙ্কুশ সরকারী অত্যাচার অন্যদিকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথে একটা তীব্র বাধা। এই অত্যাচারের হাত থেকে যদি রক্ষা পেতে আমরা না পারি-কোণ প্রকার গণআন্দোলনের মারফৎ যদি এর প্রতিবাদ করতে না পারি তবে মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে কোন স্কুল কলেজে একটীও প্রগতিশীল ছাত্র টীকে থাকতে পারবে না। ছাত্র আন্দোলনকে এই সরকারী অত্যাচারের যুপকাষ্ঠে বলি দিতে হবে। এই ভয়াবহ পরিণতির কথা এখন থেকে চিন্তা না করলে ও এর প্রতিকারের ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে না পারলে আমাদের শুধুমাত্র অস্তিত্বকেই বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। কিন্তু দেশের এই দুর্যোগের মুহুর্ত্তে বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিচ্ছে। কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল এখন সবে ঘুম ভাঙ্গতে সুরু করেছে, আর সব প্রতিষ্ঠান গুলো সহজ সাম্প্রদায়িক আহ্বানে সংগঠনকে বাড়াবার চেষ্টা করছে। সাম্প্রদায়িকতার মূল সূত্র না খুজে যুদ্ধ ইত্যাদিকে তারা সমাধান বলে ঘোষণা করছে।

আজ এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির হাত-থেকে রক্ষা পেতে হলে শ্রেণী সংগ্রামকে জোরদার করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। আজ জনতা ছাত্র মধ্যবিত্তকে বোঝাতে হবে যে সব সমস্যার মূল সূত্র হচ্ছে এই ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শোষণ। তাই বাস্তুহারা সমস্যা, খাওয়া পরা ও বেকারীর সমস্যাকে চিরকালের মত সমাধান করতে হলে চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের পথকে সুগম করতে হলে চাই ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন। এই ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনই আজ একমাত্র পথ আমি আমার সংগঠন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ষ্টুডেণ্টস ব্যুরোর তরফ থেকে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছি এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে।

দিকে দিকে এস, ইউ, সির অভিযান

গত ২৪শে এপ্রিল বিকেল পাঁচটায় পার্কসার্কাসে (কোলকাতা) এক সভায় ভারতের সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সভ্য, দরদী ও সমর্থকরা এস. ইউ. সির জন্মদিবস পালন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন 'গণদাবীর' প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জ্জি। সভার কার্য্য সুরু হওয়ার আগে প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশনের সভ্য ও সভ্যারা কয়েকটী লাল সংগীত করেন। পরে শ্রমিক নেতা কমরেড পুণ্য দেও সিং লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। জনতার মিলিত কণ্ঠ বার বার শ্লোগান দিয়ে ওঠে লাল ঝাণ্ডা কি জয়, দুনিয়ার মজদুর এক হো, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ প্রভৃতি। সভার উদ্বোধনের জন্য পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ মঞ্চে দাড়ালে পার্টির সভ্য, সমর্থক ও জনসাধারণ চারপাশের কংক্রীটের দেওয়াল কাঁপিয়ে শ্লোগান তোলে,—সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার জিন্দাবাদ, কমরেড শিবদাস ঘোস জিন্দাবাদ, কমরেড ষ্টালিন জিন্দাবাদ প্রভৃতি। কমরেড সাধারণ সম্পাদক তাঁর বক্তৃতায় এস. ইউ. সির জন্মের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের পথে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত শ্রমিকদল ভারতবর্ষে গড়ে ওঠেনি। তখনকার বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির নীতি ও নেতৃত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশেষ করে জোর দেন আর. এস্, পি ও কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর। আর. এস্. পি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে ১৫ই আগষ্টের পর তারা শ্রেণী সংগ্রামের রূপ বিশ্লেষণ করতে পারেনি। অপরদিকে কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্কারবাদ শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই অবস্থায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই এস. ইউ, সির জন্ম। তিনি আরও বলেন যে সেদিন থেকে এস, ইউ. সি কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্কারবাদের হাত থেকে শ্রমিক-শ্রেণীকে রক্ষা করার গুরু-দায়িত্ব নেয় এবং পরবর্ত্তীকালের কমিউনিষ্ট পার্টির উগ্র বামপন্থা পাতি-বুর্জ্জোয়া বিচ্যুতি থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য সঠিক বৈজ্ঞানিক কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে লড়াই করে, কমিউনিষ্ট পার্টির কবল থেকে বিকৃত মার্কসবাদ—লেনিনবাদকে উদ্ধার করার বৈজ্ঞানিক নীতি নিয়ে এগিয়ে আসে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে আজ পর্য্যন্ত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার যে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাই হল সমাজতন্ত্রের দিকে

(১৮শ পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুর্ভিক্ষ অনাহার বেকারত্বের চোরাগলিতে বিশ্ব পুঁজিবাদ

লেখক—অনিল সেন

যে পৃথিবীর দেশে পুঁজিবাদের শেকড় থাকবে যতদিন, সে দেশের সাধারণ মানুষের, খেটে খাওয়া জনতার জীবনে ততদিন সুখ নেই, সুস্থতা নেই, প্রাচুর্যের অভাবে নেই শান্তি। পুঁজিবাদের অর্থনীতির অসামঞ্জস্য তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশই তাকে ঠেলে নিয়ে যায় বিপর্যয়ের দিকে আর অচেতন সাধারণ মানুষের চোখ ফোটে তত তাড়াতাড়ি, নিরীহ মানুষ হয়ে ওঠে মরিয়া সংগ্রামী। আর এই আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে পুঁজিবাদ যুদ্ধকে ডেকে আনে, যদিও উদ্ধারের এ পথ সাময়িক। তাই গত বিশ্ব যুদ্ধে এক নাগাড়ে পাঁচ বছর রক্ত মেখে সে রক্তের আঁশটে গন্ধ মরে যাওয়ার আগেই আবার এক যুদ্ধের প্রস্তুত গড়ছে বিশ্বের পুঁজিবাদ। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাকে উদ্ধার করার বদলে তার মৃত্যুকে ডেকে এনেছে আরও কাছে। গত মহাযুদ্ধের আগে পুঁজিবাদের অসামঞ্জস্যের যে তীব্রতা তাকে যুদ্ধের প্যাঁচে ঠেলে দিয়েছে, যুদ্ধের শেষে পুঁজিবাদ তা থেকে উদ্ধার পায়নি। বরং তার বিপর্যয় আরও তীব্র হয়ে দেখা দিচ্ছে। পুঁজিবাদ অবশ্য এ কথাকে ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছে, এমন কি বাস্তবে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাবার কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে অসহায় ট্রুম্যান সরকার তার হিসেবে শিল্প-উৎপাদনের সূচীতে মিথ্যে বিলেন বাড়িয়ে রেখেছে। একথা স্বীকার করেছে Journal of Commerceএর মত প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ গত বছরে ১৪ই নভেম্বর তারিখের সংখ্যায়। প্রাচুর্যের স্বর্গোদ্যান আমেরিকায় যে শিল্প উৎপাদন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ১৯৪৮ সাল থেকে তার স্বপক্ষে প্রমান দেবে নীচের তালিকাটি।

শিল্প উৎপাদনে সাধারণ সূচী

১৯৩৭ সালে=১০০

১৯৪৮ সাল

মাস	সূচী
অক্টোবর	১৭৬
নভেম্বর	১৭৩
ডিসেম্বর	১৬৮

১৯৪৯ সাল

মাস	সূচী
জানুয়ারী	১৬৫
ফেব্রুয়ারী	১৬৪
মার্চ	১৬০
এপ্রিল	১৫৭
মে	১৫৪
জুন	১৫০
জুলাই	১৪৪
আগষ্ট	১৪৮
সেপ্টেম্বর	১৫৩
অক্টোবর	১৩৭

(সোভিয়েট ল্যাণ্ড নং ২—১৯৫০)

এ ছাড়া ১৯৪৮ সালের এক অক্টোবর থেকে ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদন কমেছে ২৮%, যন্ত্র তৈরী কমেছে ২১%, non-ferrous metalএ কমেছে ৩২% আর কাপড় উৎপাদন কমেছে ২৭%। ওপরের হিসেবে মাঝখানে উৎপাদন কিছুটা বাড়লেও অক্টোবরে আবার তা ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেল সরকারী হিসেবের মতেই অক্টোবরে শিল্পোৎপাদন ১৩৭এ কমে এল, অবশ্য এ হিসেব মাকিণ সরকারের মিথ্যে বাড়ানো হিসেব ধরে। তাকে মেনে নিয়েও দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার শিল্পোৎপাদন এক বছরে ১৫% কমে গেল। ১৯২৯—৩৩ সালের গোড়ার দিকের মত পুঁজিবাদের বিপর্যয়ের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটল। আমেরিকার অর্থনীতির ভাঙ্গন যে ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে তার জবর প্রমাণ দেবে তার একটা শ্রেষ্ঠ শিল্প মোটর গাড়ী তৈরীর ব্যাপারে। গত বছরের শেষ দিক থেকে এই শিল্পে অতি উৎপাদন (over producti n) দেখা দিয়েছে গাড়ীর খুচরো বিক্রেতাদের হাতে প্রায় ৬০০,০০০ খানা গাড়ী অবিক্রীত থেকে গেল। ফোর্ড, ক্রাইজলার কাইজার ফ্রেজার—এই সব কম্পানীগুলো গত বছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে গাড়ী তৈরীর কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হল। জেনারেল মোটর সারা সপ্তাহে মাত্র চার দিন কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে। আমেরিকার পুঁজিবাদের ভাড়াটে পত্রিকাগুলি ত মার্কিণের গাড়ী-শিল্প-উৎপাদনে সবসময়ই পঞ্চমুখ। অথচ, Nation's Business বলতে বাধ্য হয়েছে যে গাড়ীর উৎপাদন এই রকম কমে যাওয়ার অর্থ বেকারী, জনতার কেনবার শক্তি হ্রাস। কারখানা তৈরীর কাজ আমেরিকায় ৪৭ সালের তুলনায় ৪৮ সালে যথেষ্ট কমে গেল. আবার ৪৯ সালে আরও ২৮% কমে গেল। দোকান তৈরী, রেস্তোঁরা খোলার মত ছোটখাটো ব্যবসা ১৩% কমে গেল, কয়লার ব্যাপারেও একই দুরবস্থা। গত বছরে জানুয়ারী থেকে নভেম্বরের গোড়ার দিক পর্যন্ত যে কয়লা (bitumeinous) তোলা হয়েছে ৪৮ সালের ঐ কমাসের কয়লার চেয়ে ১৫৮, ০০০, ০০০ টন কম অর্থাৎ ৩১% কম। চাষ-আবাদেও কিন্তু এই হিসেবেরই জের। This is America বইখানিতে ইংরেজ সাংবাদিক ডেরেক কার্টুন লিখছেন যে মার্কিন চাষীর আয় বছরে ৬০০ ডলার। ক্ষেতমজুরের অবস্থা স্বর্গীয় রুজভেল্টের ভাষায় এত গরীবী যে সে ইউরোপের যে কোন সবচেয়ে গরীব চাষীর সমকক্ষ। আর ভাগচাষীর আয় বছরে খুব জোর ৩৮ থেকে ৯০ ডলার পর্যন্ত। অথচ মার্কিন অর্থনীতিবিদ্‌দের মতেই বাৎসরিক আয় যদি সাড়ে তিন হাজার ডলার না হয় ত ৪জন পোষ্য-ওয়ালা পরিবারের বেঁচে থাকা অসম্ভব। সরকারী হিসেব অনুসারেই চাষীর ৫৮% চির-অভাবী। পুঁজিবাদের এই ছেয়ে ফেলা সংকটের ফলে, কৃষিজাত পণ্যের চাহিদাও কমে যাচ্ছে। Wall Strcet Journal লিখছে যে ৪৮ সালের তুলনায় কৃষিজাত পণ্য ১৬% কমে গেছে' দেশীয় বাজার ছোট হয়ে, লোকের কেনবার ক্ষমতা গেছে পড়ে। মার্কিন কৃষি দপ্তর তাই হুকুম দিয়েছে ৪৮ সালের তুলনায় ৪৯ সালে আবাদী জমিতে ফসল বুনতে হবে ৮% কম। কংগ্রেস এক বিল পাশ করে বলেছে ৪৯-৫০ সালে উপ্ত জমির পরিমাণ ১৭% কমাতে হবে।

এই ত গেল পুঁজিবাদ শ্রেষ্ঠ মার্কিন মুল্লুকের ভেঙে পড়া ইতিহাস। এই যদি একচেটে পুঁজিবাদের অবস্থা হয় ত, তার আওতায় গড়ে ওঠা উপদেশগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তবু, এর দু-চারটের অবস্থা আলোচনা করা যাক্। ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের কথা ও দেশের পুঁজিবাদের প্রতিনিধিরা, তাদের কাগজ পত্র স্বীকার করেছে। Board of Tradesএর সভাপতি উইলসন বলেছেন ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকের তুলনায় ৪৯ সালে অতি প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড়ের দাম ১৫% বেড়েছে। Manchester Guardian বলেছে, গত বছরের গোড়ার ছয় মাসের প্রত্যেক জিনিষের দাম গড় পড়তায় ৫% বেড়েছে। অর্থাৎ সরকার কর্তৃক জিনিষ পত্তরের দাম কমিয়ে দেওয়ার পরেও গত বছরের ঐ ছয় মাসের তুলনায় তা ৪.৫% চড়া থেকে গেল। London and Cambridge Economic Service এর হিসেব অনুসারে ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদনের সূচী ৪৯ সালের মার্চ থেকে মে পর্যন্ত ছিল ১৩০—৩১ (১৯৪৬=১০০) আর জুলাই আগষ্টে সেটা আর ১১৫—১৭এর বেশী উঠল না। ইতালীতে উৎপাদন যুদ্ধপূর্ব ৩৮ সালের সমান ত হয়ই নি, বরং ইস্পাত উৎপাদন ৪৯ সালে ৪৮ সালের তুলনায় ৩০.১% কমে গেল। Fertilizer উৎপাদন কমল ৪২.৮%। ইতালীয় সরকারের শ্রমদলের বিবৃতি অনুসারেই সমস্ত শিল্পের (Plants) ৮% গত বছর সেপটেম্বর অক্টোবরে বেকার বসে থাকে। ২৫% এর ওপর খনিতে কাজ বন্ধ থাকে। নেদারল্যাণ্ডে শিল্পোৎপাদন গত বছরের মাঝামাঝিতে দাঁড়ায় ১২৫ (১৯৩৮=১০০), আগষ্ট মাসে ১১৫তে কমে এল। ফ্রান্সে গত বছরের শেষ দিকের মাস তিনেক আগেকার ইস্পাত শিল্পের কাজ বছরের গোড়ার দিকের তুলনায় ২৯% কম হয়। পশ্চিম জার্মানীতেও এই দুরবস্থা। পশ্চিম জার্মানীতে শিল্পের প্রত্যেকটি "অঞ্চলে অর্থনৈতিক দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়ছে"—(নিউটাইমস্, নং ১, ১৯৫০) পশ্চিম ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কারখানা Lippe vere এ্যালুমিনিয়মের কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হল। বেলজিয়ম দেশটি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের ইউরোপের একটি আড্ডা। সেখানেও ৪৭-৪৮ সাল থেকে কাপড়, চামড়া আর কাঁচ-শিল্পে সংকটে ভুগছে। কয়লা উৎপাদনে ৪৯ সালের মার্চ্চ থেকে জুলাই মাসে ২,৬১৯,০০০ টন থেকে নেমে এল ১,৮৬৯,০০০ টনে। ইস্পাত উৎপাদন গত বছরে মার্চ থেকে নভেম্বরে ৪১৬,০০০ টন থেকে নেমে এল ২৭৫,০০০ টনে। শিল্পোৎপাদনের বেলজিয়মের সূচীতে দেখা যায় গত বছরে মার্চ্চ থেকে জুলাইতে ১৩২.৪ থেকে নেমে এল ১০৪.৪ অর্থাৎ ২১% কম। ভারতবর্ষও কিন্তু এদের থেকে পিছিয়ে নেই। জাতীয় পুঁজিবাদের নেতা বিড়লার Eastern Economist উৎপাদনের যে সূচী দিয়েছে তাতেই দেখা যাচ্ছে উৎপাদন কমতির দিকে।

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংকট কাটাবার উদ্দেশ্যে

শিল্পোৎপাদনের সূচী

১৯৩৯ = ১০০

১৯৪৮ সাল

মাস	সূচী
এপ্রিল	১১৭.৯
মে	১১১.৯
জুন	১১৭.৬
জুলাই	১৯০.০
আগষ্ট	১১৮.৭
সেপ্টেম্বর	১১৪.১
অক্টোবর	১১৫.৩
নভেম্বর	১০৮.৮
ডিসেম্বর	১১৩.৬

১৯৪৯ সাল

মাস	সূচী
জানুয়ারী	১০৮.২
ফেব্রুয়ারী	১১৫.২
মার্চ্চ	১০৬.৩
এপ্রিল	১১৩.৪
মে	১১৬.৬
জুন	১১০.১
জুলাই	১০৩.৮

এছাড়া কৃষিজাত উৎপাদনেও ভারতবর্ষ মাকিণের জাতভাই। Eeastern Economist-এ প্রকাশিত নীচে তালিকাটি তার অকাট্য প্রমাণ দেবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের সূচী

১৯৩৮—৩৯ = ১০০

দ্রব্য	১৯৪৭—৪৮	১৯৪৮—৪৯
চাল	৯৮	৯৫
গম	৭৬	৭৩
জোয়ার, বাজরা	১৭৪	৮৫
ছোলা	১৩৭	১৪৭
তুলো	৫২	৫৪
পাট	৮৩	৯
আখ	১১৮	১০১
তামাক	৯৭	
চা	১৩৭	১৫২

মাঝে মাঝে বাড়লেও গড়ে কিন্তু কমে যাচ্ছে উৎপাদন। এই হচ্ছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অর্থনীতির মোটামুটি আলোচনা।

জনতার দুরবস্থা—দেনা আর বেকারী

পুঁজিবাদের অর্থনীতির এই অসামঞ্জস্যের অনিবার্য ফল ফলছে পুঁজিবাদী দেশে দেশে শিল্পোৎপাদনের কম্তির সংগে সংগে তার সহচর বেকারী আর দেনা শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দিচ্ছে জনতার। অভাবের বাড়ন্ত চাপে মেহেন্নতী জনতাকে পিষে দেবার অবস্থায় এনে ফেলেছে। আমেরিকায় Federal Reserve Bulletin গত বছর আগষ্ট মাসে লিখেছে যে দেশের জনতার ৪০% এর জমানো কোনো টাকা নেই। সহরে লোকের মোট দেনা (অবশ্য জিনিষ কিনে কিস্তিতে শোধ দেবার কড়ার ধরেই) ৪৫ সালের শেষ থেকে ৪৮ সালের শেষে এসে দাঁড়াল ৫৫,৪০০ লক্ষ ডলার থেকে ৮৪,৬০০ লক্ষ ডলার। চাষীদের অবস্থারও এতটুকু রেহফের নেই California Lands Incorporated এর কাছে ৭৩৯৮ খামার বাঁধা আছে। দেনার পরিমাণ ৪ কোটি ৩ লক্ষ ডলার। গত বছরের মোট ঋণ ছিল ৪৯০ কোটি ডলার। ফলে, ক্রমশঃ মার্কিণ চাষীরা সর্ব্বহারা কৃষকশ্রেণীতে এসে দাঁড়িয়েছে। মার্কিণ অধ্যাপক জেরোম ডেভিস তাঁর Capitalism and its Culture বই-খানিতে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মার্কিণ চাষীর এই দারিদ্র্য চিরকাল থেকে যা ব। অবশ্য পুঁজিবাদ যদি চিরকাল থাকে। এত গেল সামান্য দেনার কথা। এ ছাড়া 'দুঃখহীনের দেশ আমেরিকায় বেকার সমস্যা দেশে সুখের বিন্দুমাত্র রাখেনি। সরকারী হিসেবের খাতেই গত বছরের অকটোবরের গোড়ার দিক সুরু হয় ৩.৫৭৬,০০০ বেকার দিয়ে। অর্থাৎ ৪৮ সালের অকটোবরের তুলনায় এবারে বেকার বেড়ে গেল ২,০০০,০০০। এই সরকারী হিসেবে মিথ্যে হয়ত কিছু আছেই। Monthly Labour Review এর মতে গত আগষ্ট মাসে ৬০,০০০,০০০ শ্রমিক সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টারও কম কাজ করছে। কাজেই, দেখা যাছে, এক সরকারী হিসেবের মতে পূরো আর অর্দ্ধ-বেকারের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ। ক্যানাডায় বেকারের সরকারী হিসেব হচ্ছে ৩২.৩,০০.০। ওরা জানুয়ারী কানাডার রেডিও ঘোষণা করেছে যে বেকারী ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। The Vancouver Sun পত্রিকায় ৬ই ডিসেম্বরে এক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তার মোটামুটি বক্তব্য হচ্ছে যে চাকরীর খোঁজে বেকারের এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো ব্যর্থ হবে। তার চেয়ে নিজেদের এলাকায় তারা বাস করুক। হয়ত সেখানে "আত্মীয়-স্বজনের দয়া দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারবে।" এই হচ্ছে মর্ত্তের নন্দন-কাননের মর্ম্মকথা। ইতালীতে Labour Exchangesএর অফিসে কাজের আবেদন সরকারীভাবে যা গৃহীত হয়েছে তা ২,০০০,০০০ থেকে ২,৪০০,০০০ এর মধ্যে উঠানামা করে আর ২,৮০০,০০০ তলায় কখনও নামেনি। এমন কি ডি গ্যাসপেরী পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে তাঁর দেশে একটানা বেকারী চলচে আর প্রতি বছরে ৩৫০,০০০ লোক যাযাবর। বেলজিয়ম এবং পশ্চিম জার্ম্মাণী অর্থাৎ মার্কিণ অধীনের জার্ম্মাণীতে গত বছর নভেম্বরের শেষে ১,৩৮৭,৫০০ বেকার বসেছিল। এক পশ্চিম বার্লিনেই ৪৯র নভেম্বর পর্য্যন্ত ২৬৩,৫০০ বেকার ছিল। ভারতবর্ষও কিছু কম যায় না। এক কলিকাতা, বম্বে, মাদ্রাজের মত বড় বড় কয়েকটি সহরেই বেকার মাত্র ৩৭ লক্ষ। এ ছাড়া, ছোট ছোট শিল্পাঞ্চল আছে, আছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০,০০০ আর রেলের ৫১,০০০ হাজার ছাঁটায়ের সিদ্ধান্ত।

সোবিয়েত ইউনিয়ন ও নয়া গণ-তান্ত্রিক দেশগুলির জয়যাত্রা

অথচ এই দুনিয়ারই আর একটা অংশের খবর দেয় যে উৎপাদন কমে যাওয়ার বদলে দিনে দিনে সেখানে সেখানে উৎপাদন বেড়েই চলেছে। বেকারগুলো সব কাজে লেগে পড়েছে, সমাজতন্ত্রের দেশ সোবিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ শেষ হওয়ার সংগে সংগে দেশকে গড়ে তোলার ৫ সালা পরিকল্পনা নেয়। আর তা শেষ করে তিন চার বছরের মধ্যে। ফলে ৪৮ সালের তুলনায় ৪৯ সালে উৎপাদন বেড়ে যায় ২০%। নীচের তালিকাটিতে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে আর একটা প্রমাণ দেবে।

এ ছাড়া ধাতু কাটবার যন্ত্রপাতি বছরে ১৯% থেকে ৪২% বেড়েছে, খাদ্য, জুতো কাপড়চোপড়ের উন্নতি হয়েছে। ৪০ সালের তুলনায় চাষের ক্ষেত্রে ৩.৪ গুণ বেশী ট্রাকটর পাঠানো হয়েছে। মোটের উপর ৪০ সালের তুলনায় ৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদন ৪০% বেড়েছে। এ ছাড়া সোবিয়েত সরকার জিনিষপত্তরের দাম কমিয়েছে, আর বেকার শব্দটা বহুদিন আগে এদের অভিধানে মুছে দেওয়া হয়েছে। সোবিয়েতের জাতীয় আয় বেড়েছে ৪৯ সালে ৪৮ সালের তুলনায় ১৬% আর ৪০ সালের

পূর্ব্ববর্তী বৎসরে শতকরা অনুপাতে উন্নতি

	১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮	১৯৪৯
কয়লা	১১০	১১২	১১৪	১১৩
তৈল	১১২	১১৯	১১৩	১১৪
বিজলী	১১০	১১৫	১১৬	১১৮
লোহ	১১২	১১৪	১২২	১১৯
ইস্পাত	১০৯	১০৯	১২৮	১২৫
ধাতু শিল্পযন্ত্রাদি	১৪০		১২৪	১২৭
লবন	১৩৮	১৩০	১৪৩	১৩০

আবার পৃথিবীজোড়া যুদ্ধের তোড়জোড়

শান্তিকামী সংগ্রামী গণমোর্চা গড়ে যুদ্ধকে রুখুন

তুলনায় ৩৬%। ফলে সোবিয়েত বাসীর মাথা পিছু আয় বেড়েছে ৪০ সালের তুলনায় গড়ে ২৪%। চাষীদের আয় ৪০ সালের তুলনায় ৩০% বেড়েছে। চাষের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি ঘটাবার জন্যে সোবিয়েত সরকার হাজারে হাজারে ট্রাক্টার আর উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি পাঠাচ্ছে। জনতার কেনবার ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। ৪৮ সালের তুলনায় পশমী জিনিষের বিক্রি বেড়েছে ৬৭%, রেশমী পদার্থ ৫০%, বেতার দেড় গুণ, মোটর সাইকেল ৫৫%। এ ছাড়া শুধু পল্লী অঞ্চলেই বাড়ী তৈরী হয়েছে ২৩ লক্ষ, ২৭টি অঞ্চলে ট্রাম ও ট্রলি বাস চালু হয়েছে, হাঁসপাতালে ৩৮,০০০ বিছানা বেড়েছে, ডাক্তার বেড়েছে ২৬,০০০, এই ত গেল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মহান নেতার সাফল্যের মহাভারতের দুচার কথা এবার একবার চাষী মজুররাজ নয়া গণতন্ত্রের হালটা পরীক্ষা করা দেখা যাক।

চেকোশ্লোভাকিয়ার চাষী মজুর নিজের দেশকে গড়ে তোলার ৫-সালা পরিকল্পনা ১০২% পূর্ণ করে ফেলেছে, ৩৭ সালের তুলনায় সেখানে বিজলী শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে ২ গুণ, কাপড়, দেড় গুণ, ট্রাকটর ১৬ গুণ ৪৮ সালের তুলনায় গত বছরে মজুরী বেড়েছে ১৫% চাষীর আয় বেড়েছে ১৬%। খাদ্যের দর কমে অর্দ্ধেক হয়েছে, কাপড়ের দর কমেছে ২৪%, জুতোর ১৫% ৪৯ সালে ২১০০০ নতুন বাসাও তৈরী হয়েছে। এ দেশে শিল্পোৎপাদন যুদ্ধপূর্ব উৎপাদনের ১০% বেড়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে কোন পুঁজিবাদী দেশ আজও যুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় আসেনি। পোল্যাণ্ড অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে যে ৩ শালা পরিকল্পনা নিয়েছিল তা তারা পূর্ণ করে ২ বছর দশ মাসে। তার ফলে সেখানে গত বছরে শিল্পোৎপাদনের মোট পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব্ব পরিমানের চেয়ে ৭৫ পারসেণ্ট বেড়েছে চাষ-আবাদের ব্যাপারেও মাথা পিছু আয় যুদ্ধপূর্ব্ব অপেক্ষা ১২ পারসেণ্ট বেড়েছে। হাংগেরী ৩ সালা পরিকল্পনার শেষে মেহনতি জনতার জীবনধারণের মান বেড়েছে ৩৭ পারসেণ্ট। গৃহস্থালীর জন্যে বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বেড়েছে ৪০ পারসেণ্ট আর গ্যাস ৬০ পারসেণ্ট। সেখানে সমস্ত দ্রব্যের বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের দর কমে গেছে ৫০ পারসেণ্ট। রেশনিং এখন ওদের কাছে রূপকথা। চীনেতে চিয়াংকাইশেকের দস্যুরাজ খতম করে কমরেড মাও-সে-তুঙ সৈন্যদলের বহু অংশকে ডাক দিয়েছেন দেশ গড়ার কাজে লেগে পড়তে। Jenmingjiphao কাগজ খবর দিয়েছে কতকগুলি বড় বড় সৈন্য ইউনিট ইতিমধ্যেই রাইফেল রেখে কাস্তে ধরেছে উত্তর চীনে। ১৯৫০ সালে প্রত্যেকটি সৈন্য দেড় একর জমি চষে ফেলবে। এক সেন্‌সী আর স্থই-ইউয়ান প্রদেশেই চষা হবে যথাক্রমে ১৭,০০০ আর ২৩.০০০ একর জমি।

মার্শাল পরিকল্পনার ব্যর্থতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ধনতন্ত্র আরও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধে সোবিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের সংগে সংগে সমাজতন্ত্রের পক্ষ আরও জোরদার হল। ওদিকে ধনতন্ত্রের শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল ইউরোপের নয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলো। আর এশিয়ায় চীন ভিয়েৎমিনের মুক্তি ধনতন্ত্রের ভিৎকে আলগা করে দিল। আর যুদ্ধের অনিবার্য ফল হিসেবে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়; ফলে পুঁজিবাদ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে সুরু করেছে। তার প্রমাণ দিয়েছে ওপরের আলোচনা। এই ছেতরে যাওয়া অর্থনীতি থেকে রেহাই পাবার জন্যে একচেটে পুঁজিবাদের রাজ্য আমেরিকা মার্শাল প্ল্যানের সাহায্য নিল। অর্থাৎ নিতান্ত পরোপকারীর মুখোস পরে দুর্বল, অনুন্নত ধনবাদী দেশগুলিকে ডলার সাহায্য করার প্রস্তাব নিল। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, এইসব ছেলেমানুষ ধনবাদী দেশগুলিকে গড়ে তুলতে হবে। তার অর্থনীতিতে সামঞ্জস্য আনতে হবে, জনসাধারণের অভাব মেটাতে হবে। কিন্তু পেছনের উদ্দেশ্য থেকে গেছে যে নিজের দেশের অতি উৎপাদিত মালগুলি এদেশে চালান দিয়ে নিজের কোলে ঝোল টানা। নিজের দেশের লগ্নি পুঁজি খাটাবার জন্যে আর ডলার ধার দেওয়ার নাম করে এই সব দেশগুলিকে অর্থ নৈতিক দাসত্বে বেঁধে ফেলা। আর এই সব দেশগুলির পক্ষেও সহৃদয় মার্কিনের মুখ চেয়ে না থেকে উপায়ও নেই। কারণ এদের পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতায় মার্কিন পুঁজিবাদের সংগে পেরে ওঠে না। এবং পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে হলে মার্কিণের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া পথ নেই। ফলে, মার্শালীকৃত দেশগুলিতে এতটুকু উন্নতি হয়নি। তার কারণ, গত ছবছরে ফ্রান্সের কয়লা শিল্প ৫০, ০০০ আর রেলে তারও বেশী ছাঁটাই হয়েছে। এক সীন অঞ্চলেই বেকার হয়েছে ২৫, ০০০। ২ লক্ষ লোক সপ্তাহে ৩২ ঘণ্টার কম আর ৪, ৫৫, ০০০ লোক সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কম কাজ করছে। অথচ, ৪৭ সালে কাজ করেছে ৯২ হাজার। ৩৮ সালের তুলনায় ফরাসী শ্রমিকের মাইনে কমেছে অর্দ্ধেক। ব্রিটেনে গত নভেম্বরে বেকার দাঁড়িয়েছে ৩২৩০০০। অসংখ্য লোকের ঘরবাড়ীর কোন বালাই নেই। ব্রিটেনের গৌরব খোদ লণ্ডনেই ২লক্ষ পরিবারের মাথা গোঁজার কোনরকম ঠাঁই নেই। ব্রিটেনের জাহাজী শ্রমিকদের ২৫৪০০০ জনের মধ্যে ৭৫ হাজারকে বেকার করে দেওয়া হয়েছে। আরও ৭৫ হাজারের ওপর বেকারীর পরোয়ানা এলো বলে। মার্শাল পরিকল্পনায় জীবন যাত্রার মান বাড়াবার যত কথাই থাক না কেন বাস্তবে কিন্তু ঘটেছে ঠিক তার উল্টো। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসেবে দেখা যায় যে ৩৬ সালে ৫জন পোষ্য-ওয়ালা পরিবারের সাপ্তাহিক খরচ হত ২৩ শিলিং ৯ পেন্স, সেখানে গত বছরে প্রয়োজন হয় ৪৮ শিলিং ৮ পেন্স। লক্ষ্য করবার বিষয় মাইনে কিন্তু বাড়েনি। ওদিকে ৩৮ সালের তুলনায় শিল্পজাত জিনিষের দর বেড়েছে ১৪৫.৫% আর খাদ্য ও তামাকের দর বেড়েছে ১১৯.৪%। ইতালীতে জিনিষ পত্তরের দাম যুদ্ধপূর্ব দামের তুলনায় বেড়েছে ৬০ গুণ। মার্শাল সাহায্য দিয়ে এই সব দেশগুলিকে মার্কিন কুবেররা এমনভাবে দাস করে ফেলেছে যে তাদের উৎপাদিত জিনিষপত্তর এই সব বাজারে কাটতি করবার জন্যে এই সব দেশে ঐসব পদার্থের উৎপাদন হতে দেবে না। বিশেষ করে ভারী শিল্প গড়ে তুলতে মার্কিন একচেটে পুঁজিবাদ কোনমতেই দেবে না। ভারী-শিল্পের জন্যে ভারবর্ষ ত ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। উপরন্তু, উপদেশ নিয়ে এসেছে কাঁচা-মালের উৎপাদন বাড়াতে। অর্থাৎ, একচেটে পুঁজির বাজার যাতে ভাল ভাবেই হাতের মুঠোয় থাকে। ফ্রান্সে বিমান, ট্রাক, তামাক উৎপাদন দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ফরাসীদের ৫২টি জেলায় তামাক হয়। উমানিতে পত্রিকায় খবরে প্রকাশ যে মার্শালী খয়রাতের বদলে আমেরিকা দাবী করেছে যে ২০০ কোটি ফ্র্যাংক দিয়ে আমেরিকা থেকে তামাক সিগারেট কিনতে হবে। এই ভাবে, কন্‌সিউমারী জিনিষ কিনতে বাধ্য করছে মার্শাল প্ল্যানের আবিষ্কর্তারা। এদেশের কোন এক কারখানার ম্যানেজার জাঁ কন্‌স্ত নৃত্ত লিখেছেন, যে মার্কিন পুঁজিপতিরা ফরাসী বাজারকে অদরকারী ইঞ্জিনে ছেয়ে ফেলেছে। রেল গাড়ীর বোঝা চাপিয়ে দেশী রেলগাড়ী উৎপাদন বন্ধ করছে। কৃষিযন্ত্র পাঠিয়ে যাচ্ছে ওরা অথচ ফ্রান্সের গুদামে দেশী কৃষিযন্ত্রে মরচে ধরছে। কাজেই, বেকার-সমস্যা মেটেনি উপরন্তু বেড়েছে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়নি। বিপর্যয়ের কবল থেকে এতটুকু রেহাই পায়নি পুঁজিবাদ। তার অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যকে সে যত জোড়াতালি দিয়ে চালাবার চেষ্টা করুক না কেন, ঘুণ ধরা ভিৎ ঝরে পড়বেই। তার জবর প্রমাণ চিয়াং। কাজেই, মার্শাল পরিকল্পনা হচ্ছে আমেরিকার একচেটে পুঁজির বাজার দখলের নয়া-কায়দা। এমন কি আমেরিকার মিল-মালিকদের মুখপত্র Northwestern Miller তার মে সংখ্যায় লিখেছে যে মার্শাল পরিকল্পনাকে নিতান্ত সাধু উদ্দেশ্য বলে, ইউরোপে যতই জনস্বার্থরক্ষাকারী বলে প্রচার করা হোক না কেন প্রকৃতওক্ষে তার বদলে মার্শাল পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু বাদ দিলেও Northwestern Miller এর এই উক্তিটি মার্শাল পরিকল্পনার ব্যর্থতার যথেষ্ট প্রমাণ।

যুদ্ধ প্রস্তুতি

গত মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একদিকে যেমন সংকট আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে অপরদিকে তেমনি পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ থেকে চিরকালের জন্যে সংকট নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সোবিয়েত সর্ব্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ। অনেক আগেই সে সাম্রাজ্যবাদী শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। এবার সারা চীন মুক্ত এলাকা, ইওরোপের বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, পূর্ব্ব-জার্ম্মাণীতে প্রভৃতি দেশে মুক্তির বিজয়োল্লাস। ভূগোলের মানচিত্রের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে মুক্ত এলাকাটী—উত্তরে রওয়ে-সুইডেনের চূড়ো থেকে পূবে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত, আবার ওখান থেকে

(শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মতবাদিক অভ্যাস কর্মের অভ্যাস ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অমার্কসীয় ধারণা

লেখক—শিবদাস ঘোষ

সাধারণ সম্পাদক, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার

ভারতবর্ষে সাম্যবাদী আন্দোলন আজকে মতবাদিক ও সাংগঠনিক উভয় দিক থেকেই জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। শুধু যে জনসাধারণই এই ঘোলাটে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে তাই নয়, এমন কি শোষিত মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শক—তাদের বিপ্লবের হাতিয়ার মার্ক্সীয় দর্শন, ও সাম্যবাদের আদর্শ ও সংগ্রাম কৌশলও যোশী ও রণদীভেমার্কা কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার পেটী বুর্জোয়া সুলভ দোদুল্যমান ও অস্থির নেতৃত্বের হাতে বিশেষভাবে বিকৃত হয়েছে। সাম্যবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে বিকৃত ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—তার জন্য রণদীভেমার্কা কমিউনিষ্ট পার্টিই দায়ী। কারণ বাস্তবভাবেই সেদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সাম্যবাদী-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল এদেরই কার্য্যকারিতার উপর। এরা সে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণরূপে অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সংগঠন হিসাবে একসময় যথেষ্টশক্তিশালী থাকা সত্ত্বেও ভুল নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণের জন্য জনতার বিপ্লবী আন্দোলনকে এরা ঠিক পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয় নি। ক্রমাগত ভুল করে এবং সেই ভুল সংশোধন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে মার্কসবাদকে সেই সমস্ত ভুলের সমর্থনে অতি জঘন্যভাবে এরা ব্যবহার করেছে। ফলে দলীয় চিন্তাধারায় মার্ক্সীয় যুক্তি বিজ্ঞান অপেক্ষা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে analogy ও Historical parallel ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কথাকেই মাপকাঠি বলে ধরা হয়ে থাকে, যারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে প্রতিবারই আত্মসমালোচনার নাম করে দলের সভ্যদের আত্মতৃপ্তিমূলক আলোচনায় সন্তুষ্ট হতে দেখা যায়। দলীয় গোঁড়ামি, দলের মধ্যে পেটি বুর্জ্জোয়া চিন্তাধারার প্রাধান্য ও absolute authorityর কুসংস্কার দলকে সঠিক মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়ে তোলার পথে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্ব্বে আমরা বহু আলোচনায় দেখিয়েছি কমিউনিষ্ট পার্টি নামের সুযোগ নিয়ে যোশী মার্কা এই দলটি এর জন্মের পর থেকে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে তার সাথে মার্ক্সীয় দর্শন ও সাম্যবাদের মূল সংগ্রাম নীতির কোন সম্বন্ধত নেই উপরন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে সাম্যবাদী আদর্শকে এরা বিকৃত করে তুলে ধরেছে। এদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস শোষিত জনসাধারণের কাছে আজ আর অজানা নয়। তাই এখানে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু মাত্র একটি দিকের প্রতি জনসাধারণ ও বিশেষ করে এই দলের সাধারণ কর্মী যারা সত্যিই শোষিত জনসাধারণের মুক্তি ও সাম্যবাদী আদর্শের জন্য লড়াই করছেন তাঁদের কাছে তুলে ধরতে চাই। ভুলের পর ভুল করেও যে বিশেষ কারণের জন্য ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নামধারী দলটি অতীত ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সত্যিকারের পথ বেছে নিতে আজও সক্ষম হচ্ছে না তা' হচ্ছে Theory ও practice সম্বন্ধে এদের মার্কসীয় বিজ্ঞান সম্মত ধারণার অভাব। Theory ও practiceকে এরা আলাদা মনে করে ও কর্মীদের তাই বুঝিয়ে থাকে; কারণ মতবাদগত বিভ্রান্তি যেখানে দেশকে আজ সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে সেখানে শুধুমাত্র সংগঠন শক্তি ও কর্মীদের মধ্যে অন্ধ কাজের উন্মাদনা সৃষ্টি করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তাই যখনই বিরুদ্ধ কোন সাম্যবাদী দলের মতবাদিক আলোচনার ফলে দলের সভ্যদের মধ্যে নিজেদের কর্ম্মকৌশল ও আদর্শ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দেয় তখনই এরা theory সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে, সাধারণ কর্মীদের ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়। — যেমন শুধুমাত্র theory দিয়ে বিপ্লব সফল করা যায় না, theory সম্বন্ধে কিছু শিখতে হলে শুধুমাত্র authoritative source অর্থাৎ দলের নেতাদের কাছে থেকেই তা শিখতে হবে। তাঁদের মতবাদিক আদর্শ খাঁটি যাঁরা practical (অবশ্য এঁদের ধারণানুযায়ী) কারণ practice, theory বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।" সাথে সাথে একটি কথা অতি সুকৌশলে এরা চেপে যায় যে আবার এই practice ও সত্যিকারের conscious practice কিনা তা নির্ভর করে প্রতিনিয়ত মূলনীতিকে (theory) সামনে রেখে তারই মাপকাঠিতে practical movementকে বিচার করে দেখার উপর। প্রতিনিয়ত theory অনুশাসন ব্যতীত যে কোনরূপ আন্দোলন blind practical movement মাত্র, আর এই ধরণের blind practice এর দ্বারা আর যা কিছু করা সম্ভব হোক না কেন সঠিক বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। আসলে এই সমস্ত ধারণার মূলে রয়েছে theory ও practice এর বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। Formal logic অনুযায়ী বোঝার সুবিধার জন্য একই সামগ্রিক human practice এর দুইটি পদ্ধতিকে আলাদা করে বোঝান হয় theory ও practice এই নামে বিভক্ত করে। এর একটি dialectical যুক্তিবিজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পদ্ধতি ও অপরটি সেই সকল পরীক্ষিত সত্যকে জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে guiding principle হিসাবে অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা ও সাথে সাথে যুক্তি বিজ্ঞানের মারফৎ প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান দেওয়া। কাজেই যেখানে সাম্যবাদের মূল নীতি ও যুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন পরিচালনা করা হয় না, সেখানে দলের practice ও theory আলাদা হতে বাধ্য এবং কাজে কাজেই উহা blind practice মাত্র। মার্কসবাদী মাত্রেরই একথা এক মুহূর্তের জন্য ভুললে চলবে না—theory একটা মনগড়া ব্যাপার নয়; তর্কশাস্ত্র অথবা Crude practice (blind) এর কোনটাই theoryর বৈজ্ঞানিকতা বিচারের মাপকাঠি নয়। Theory হচ্ছে subjective human practice; দ্বান্দ্বিক যুক্তি বিজ্ঞান এর বিচারের মাপকাঠি। আর এই theoryর objective expression, বাস্তব প্রয়োগকে আমরা practice বলে বুঝে থাকি অর্থাৎ এ theory হতে বিচ্ছিন্নতো নয়ই বরং theory applied in our day to day activities of life in the struggle for freedom is called practice. And only out of experiences of this type of practice the theory is subject to further verification. একথা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব ও কর্মীরা বুঝতে অক্ষম অথবা ইচ্ছে করে বুঝতে চাননা। কারণ তা' না হলে প্রতিবারই ভুলস্বীকারের সময় কি করে এই ধরণের কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব—"Party theoretically কোন ভুল করেনি অর্থাৎ পার্টি গৃহীত theory তে (নীতি) কোন ভুল ছিল না কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাকে apply করতে গিয়ে ভুল হয়েছে।" এই ধরণের কৈফিয়ৎ প্রমাণ করে Mistake in practice কে এরা একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে করে কারণ তা মনে না করলে মার্কসবাদী মাত্রের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য কি করে প্রতিবারই উপরোক্ত একই ধরণের কৈফিয়ৎ দেওয়া সম্ভব হয়। এখানে strategy ও tactics এর আলোচনা এসে পড়ে। Theory ও practice অর্থাৎ আন্দোলনের ক্ষেত্রে strategy ও tactics যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং strtegyর উপর ভিত্তি করেই যে policy ও tactics নির্দ্ধারিত হয়—একথা প্রত্যেক মার্কসবাদীরই জানা আছে। strategy applied in day to day practices is the tactics of the party একথা স্বীকার করলে tactics বার বার ভুল প্রমাণিত হবার পরেও একথা বলা চলে, কি strategy নির্দ্ধারণে পার্টির ভুল হয়নি? কারণ tactics ভুল হয়েছে একথা বললে অস্বীকার করার উপায় নেই, হয় strategy ভুল অথবা tactics ও strategy সম্বন্ধযুক্ত নয়। তবু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে শুধু মাত্র tactics গ্রহণেই ভুল রয়েছে তাহলে কমরেড ষ্টালিনের "theory without practice is sterile and practice without theory is blind"—এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি প্রমাণ হয় না যে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির theory ও practice এর মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই।

অন্ধ আনুগত্যের কথা ফ্যাসিষ্টরাই বলে

কাজে কাজেই কম্যুনিষ্ট পার্টির theory sterile ও practice অন্ধ কর্ম্মপ্রচেষ্টা মাত্র। আমরা বার বার বলে আসছি communist partyর কর্ম্মপ্রচেষ্টা blind এবং ওর পেটী বুর্জ্জোয়া নেতৃত্বের absolute authorityর দ্বারায় পরিচালিত। দলের এই ধরণের blind practice একদিকে দলের মধ্যে ব্যুরোক্রাটিক নেতৃত্বের সৃষ্টি করেছে ও অন্যদিকে iron-discipline এর নাম করে কর্ম্মীদের blind discipline শিক্ষা দিয়েছে। বিপ্লবী সর্ব্বহারা দলের পক্ষে Iron discipline অপরিহার্য্য ব্যাপার হলেও ইহা কখনও অন্ধ আনুগত্য বোঝায় না। "Iron discipline does not preclude but presupposes criticism and contest of opinion within the party, Least all does it mean that discipline must be blind, on the contrary, iron discipline does not preclude but presupposes conscious and voluntary submission, for only conscious discipline can be truly iron discipline" (Problems of Leninism) আর যেখানে এই iron discipline কর্ম্মীদের conscious ও Voluntary submission বোঝায় না সেখানে তা ফ্যাসিষ্টদের blind military discipliue এর সমান। এই ধরণের অন্ধ আনুগত্যের ফলে party fanaticism দেখা দেয়। আর এই fanaticism দলীয় স্বার্থ রক্ষার পক্ষে যত সুবিধাজনকই মনে হোক না কেন এ মার্কসবাদী দলের নীতি বিরুদ্ধ এবং দলের 'যান্ত্রিক' একেন্দ্রীকরণের পরিচায়ক। প্রত্যেক মার্কসবাদীই একথা স্বীকার করবেন the more the blindness the more the fanaticism কোন মার্কসবাদীদলের পক্ষে আদৌ গৌরবের নয় পরন্তু ইহা দলের collective leadership গড়ে তুলতে একটা মস্ত বাধা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি এই fanaticism কে ভিত্তিকরে আজকে দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং কাজ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার আড়ালে কর্ম্মীদের বিপ্লবী সচেতনতা (ideological equipment) গড়ে তোলার মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত কর্ম্মীদের বোঝান হচ্ছে "Be more practical." এবং এরই ফলে কর্ম্মীদের মনে একপ্রকার পেটীবুর্জ্জোয়া সুলভ Vanity সৃষ্টি করা হচ্ছে। যার চাপে তাদের পক্ষে মতবাদ বিচার-বিশ্লেষণ এর ব্যাপারে নিজেদের অক্ষমতা উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। Theory সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি ব্যতীত ও মার্কসবাদী যুক্তিবিজ্ঞান ভাল জানা না থাকলে শুধু মাত্র "ভালকর্ম্মী" হলেই partyর theory বিচার করার যোগ্যতা আসে না, ফলে যে দলে বেশীর ভাগ কর্ম্মীই এই ধরণের "ভাল কর্ম্মী" মাত্র--সেই দলে এক শ্রেণীর মুষ্টিমেয় আত্মকেন্দ্রিক theoretician এর সৃষ্টি হয় এবং দল মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে মুষ্টিমেয় একদল আত্মকেন্দ্রিক theoreticians ও অন্যদিকে অন্ধ "ভাল কর্ম্মীর" দল। এই ভাবে দলের পক্ষে theory ও practice কার্য্যতঃ আলাদা হয়ে পড়ে। তাই বাস্তব আন্দোলনের মধ্য থেকে দল যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তা সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা হতে পারে না। আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রও তাই proletarian democracy না হয়ে formal democracy হতে বাধ্য। এই ভাবে উপর থেকে মতবাদিক আন্দোলন পরিচালনা করার নীতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে মার্কসবাদকে dogmaয় পরিণত করেছে। Theory বিচারের পদ্ধতি formal logical পথ অনুসরণ করে চলেছে ও চিন্তার গতিশীলতায় Law of causality কে logical determinism হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে এবং এইভাবে ultimately. মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান ভারতের কমিউনিষ্টপার্টির হাতে নিছক তর্কশাস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টির এই সমস্ত মারাত্মক বিচ্যুতির ফলেই a group of self confined abstract theoretician guiding the rest of the party members and workers in an absolute authoritarian manner which has given birth of a bureaucratic leadership at the top and by this has completely destroyed the possibilities of forming a working-Class-party.. the Communist party worth the name.

সর্ব্বশেষ কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম্মীদের কাছে আমাদের আবেদন "A Marxist must not be afraid of making mistakes" এর দোহাই পেড়ে আজ আর কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন করার ও একমাত্র সাম্যবাদী দলহিসাবে মনে করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। Partyর ইতিহাস যাদের মতবাদিক ভুলভ্রান্তি ও বিচ্যুতিরই ইতিহাস মাত্র তাদের পক্ষে উপরের ঐ বিখ্যাত মার্কসবাদী উক্তিটা ব্যবহার করা শুধু অযৌক্তিক নয় অপরাধও বটে।

বিজ্ঞপ্তি

যে সমস্ত গ্রাহকবৃন্দের গণদাবীর চাঁদা বাকি পড়িয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে পরিচালকের নিকট চাঁদা পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দলের জিলা কমিটি ও ইউনিটগুলিকে তাঁহাদের বাকি চাঁদা অবিলম্বে শোধ করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

রথীন সেন
পরিচালক, গণদাবী ৪৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১৩

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হামারা পথ
কার্য্যালয় ঃ— ৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

সচেতন আনুগত্যেই লৌহ নিয়মানুবর্ত্তিতা আসে

সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম শান্তির লড়াই

(১৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

দ জাপানকে বাইরে ফেলে কোরীয়া আধখানা ধরে মহাচীনের সীমা ধরে ভি নামের মাথা পর্য্যন্ত, এখান থেকে বর্ম্মা ভারতের উত্তর সীমান্ত ছুঁয়ে কাস্পিয়ান সাগরের পাশ ঘেঁসে কৃষ্ণ সাগরকে বেড় করে যুগোশ্লোভিয়াকে কেটে রেখে ইতা র মাথা দিয়ে পূব-জার্ম্মাণীকে টেনে নিয়ে বলটিক্ সাগরের তীর পর্য্যন্ত—এই মাট এলাকা জুড়ে মুক্ত মানুষের উল । আর এই মুক্ত এলাকা থেকে মুক্তি বাতাস এসে দোলা দিচ্ছে পুঁজিবাদ দেশের মেহেন্নতী জনতাকে। কাজেই পুঁজি কে বাঁচতে হলে, যেমন এই সব মানুষকে পিষে মারতে হবে, তে পুঁজিবাদী দেশগুলির মুক্তির লড়া ক ঠেকাতে হবে। আর এই পথে সে তার অর্থনৈতিক সংকটকে কা ওঠবার দুঃস্বপ্ন দেখছে। তাই সে জ যুদ্ধোন্মাদ। আর যুদ্ধ করব বল যুদ্ধ করা যায় না। তার জন্যে প্রস্ত চাই সে প্রস্তুতিই আজ পুঁজিবাদ গড়ে চলেছে দিকে দিকে, ঝড়ের বেগে। এক একটা অঞ্চলের পুঁজিবাদী দেশগুলি নিয়ে এক একটা ব্লক গড়েছে। আ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাম্যবাদ-বিরোধী জেহাদে তারা পরস্পরকে সাহায্য করবে—এমন কি সৈন্য পাঠিয়েও। তাই নর্থ-আতলান্তিক চুক্তি, ভূমধ্যসাগরীয় ব্লক, কম থ কনফারেন্সের মারফৎ পুঁজিবাদ ই সমস্ত নয়া গণতান্ত্রিক ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আঘাত হান সারা মুক্ত এলাকাকে ঘিরে সাম ঘাঁটি গেড়ে চলল—ই তমধ্যেই ৪৮ ঘাঁটি তৈরী হয়েছে, আরও হবে। কি এই ঘাঁটি তৈরী করে সোভিয়েত শিবি ক একটা শিকল দিয়ে ঘিরে রাখ চেষ্টা চলেছে সেটা লক্ষ্য করতে হলে শ্চিম থেকেই শুরু করা যাক। ব্রিটে নিজস্ব সৈন্য ত আছেই, তার ওপর মার্কিণ সৈন্য ও বোমারু বিমান সেখা আড্ডা গেড়েছে। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে যুদ্ধের সরঞ্জামের গুদাম হয়ে রয়েছে। পূর্ব্ব- ীরা ত আজ ইঙ্গমার্কিণ সমরলিপ্সু র কাছে দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পেনে তার উপনিবেশে এবং পর্তুগালে মার্কি সামরিক ঘাঁটি তৈরী হয়েছে প্রায় ১০ ওপর। মাদ্রিদের বারাকাস বিমা টি আমেরিকা কিনে নিয়েছে। বৃহত্তম মানঘাটি বার্সিলোনার প্রাৎঘাটি, ভ্যালে য়ার মনিসাস বিমানঘাটি মার্কিণ কবলিত। ১৯৪৮ সালের চুক্তি অনুসারে পর্তুগালের আজোর্সের লাগেনো বিমানঘাটিতে মার্কিণ সামরিক ও বেসরকারী বিমান নামতে পারবে ৩ থেকে ৫ বছরের জন্যে কোন ট্যাক্স লাগবে না। এ ছাড়া পর্তুগীজ উপনিবেশ ম্যাকাও, টিমোর, এবং মোজাম্বিকে, আর সেতুবাল, ইবোরা, অস্তদা সোর, ব্রাগান্সা সহরেও কতকগুলি নতুন সামরিক ঘাটি তৈরী হয়েছে।

এই ত গেল উত্তর আতলান্তিক অঞ্চলে যুদ্ধের তোড়জোড়। এবার ভূমধ্য সাগরকে পরীক্ষা করা যাক্। এ অঞ্চলকে যুদ্ধের ঘাঁটি করে গড়ে তোলার ভার পড়েছে তুরস্কের ওপর। তুরস্ক পররাষ্ট্র সচিব সাদক ত পরিস্কার বলেই দিয়েছে—"I hope that in time a sort of Mediterranean Entete will be formed with the participation of Turkey, Greece and Italy"—আর মুখের কথা বলেই তারা থেমে যায়নি। এ কথাকে তারা ভালভাবেই রূপ দিয়েছে। ইতালী ও তার উপনিবেশগুলিতে যুদ্ধ ঘাঁটি তৈরী হয়েছে। নেপলস্, তোরন্ত, লিভর্নো, জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীর ঘাঁটিগুলি আমেরিকা ব্যবহার করছে। গত বছরের ২রা ফেব্রুয়ারী আমেরিকার সাথে ইতালীর গোপন যে চুক্তি হয়, সেই অনুসারে তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে মার্কিণকে ইতালীর বুকে পা রেখে যুদ্ধ করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। ওদিকে ত্রিপলীর মেল্লুহ ঘাঁটিটি সর্ব্ববৃহৎ ঘাঁটি হিসেবে তৈরী হচ্ছে। এখানে ৭০টি বৃহত্তম বোমারু ও ৩০০ জঙ্গী বিমান থাকতে পারে।

এ ছাড়া তুরস্ক ত আছেই। মধ্য প্রাচ্যের তৈল খাণগুলি প্রায় সবই ইংগমার্কিণের হাতে।—আর শুধু হাতে বললে ঠিক হবে না; সেখানে ইঙ্গমার্কিণের রীতিমত দাস রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মানুষই সেখানে কেনাবেচা হয়। কাজেই, সেখানে ত সামরিক ঘাঁটি হবেই এবং হচ্ছেও। চীনের কোলে ভারতের উত্তর সীমান্তে কাশ্মীরে ও নেপালে মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি তৈরী হচ্ছে।

এবার প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে আসা যাক। এখানে ইঙ্গমার্কিণ স্বার্থে যে আত্মরক্ষা ত্রিভুজ" তৈরী হয়েছে তার ওপরের কোণ হয়েছে ফিলিপাইন, আর ভূমি হচ্ছে পানামা থেকে সামোয়া হয়ে নিউ হেব্রাইডস্ পর্যন্ত। ফিলিপাইনের সেবু ঘাঁটি অন্যতম। এ ছাড়া আছে পোর্ট প্রিন্সেস্ তাউই তাকুই, গিমেরা, তম্বুয়া, মাজেন্তা, এস্পিরিতু সান্তো এবং আরও অনেক অনেক। পূর্বে আরও একটু ওপরে সোবিয়েতের ঠিক পাশে জাপানকে এক শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। এমন কি তার পুলিশবাহিনীকে পর্যন্ত ঢেলে সাজা হচ্ছে। আর সমর নায়ক ম্যাক্-আর্থার ত সর্ব্বশক্তিমান সূর্য্যদেব হয়ে বসেই আছেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার পুঁজিবাদী সংকট থেকে ভারত বাদ পড়েনি। আর এক যুদ্ধ জনতার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র দুনিয়ার পুঁজিবাদ করছে। ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র তাতে পূরা সমর্থন ও সমরলিপ্সুদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। আজ এই ভয়ানক দুর্য্যোগের সামনে ভারতের মেহন্নতী জনতাকে বাঁচাবার দায়িত্ব এসে পড়েছে যে দু-একটা শ্রমিক দল আছে তাদেরই ওপর। আজ যুদ্ধ বিরোধী গণ-ফ্রন্ট গড়ে তার মধ্যে টেনে আনতে হবে সমস্ত শান্তিকামী মানুষকে কোন বাচবিচার না করে,, কারণ আজ এই যুদ্ধবিরোধী গণ-ফ্রন্টের মারফৎ সবচেয়ে বেশী শক্তিকে টেনে আনতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর আওতায়, এগিয়ে যেতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে। যতদিন না এ কাজ শেষ হচ্ছে, ততদিন স্থায়ী শান্তি নেই। এই পথেই সোবিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পৃথিবী-জোড়া শান্তির লড়ায়ে ভারতবর্ষকে অংশ নিতে হবে। শ্রমিক-শ্রেণীর নিজস্ব দল সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার তারই ডাক নিচ্ছে।

পড়ুন

১। সোস্যালিষ্ট পার্টির সোস্যালিজম

২। দল ও দলের সংগঠন

৩। পথের ইঙ্গিত

৪। জনতার জঙ্গী আওয়াজ

৫। A Critique of Communist movement in India.

৬। The National and the International Situation.

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভুল বিশ্লেষণ

মানুষের মত বাঁচার পথ

জানিতে হইলে

সোভিয়েট ল্যাণ্ড

পড়ুন

অনুসন্ধান করুন :—টাস নিউজ এজেন্সি, ৬, ক্যানিং রোড, নয়াদিল্লী

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫

মধ্যবিত্তের বাঁচার পথ সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

আবার দৈন্যের তাড়নে, দুর্দ্দশার পীড়নে যখন সে নিরুপায় বোধ করে তখন সে চায় শোষণের অবসান। এই দুই বিপরীত চিন্তা তার মধ্যে রূপ নেয়। এই চিন্তারই অভিব্যক্তি হল গান্ধীবাদ। গান্ধীবাদ পুঁজিবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান চায় কিন্তু পথ যা সে বাৎলায় তা হল মধ্যবিত্তের এই দোনা মনা পথ, ভুল পথ, পুঁজিবাদকে প্রতিষ্ঠা করার পথ। সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব এবং তার মধ্যে দিয়ে মানব সমাজের অগ্রগতি একথা মানলে বিপ্লবকে অস্বীকার করা যায় না! আর সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করলে পুঁজিবাদের পূর্ণ উচ্ছেদ এসে যাবে। যা মধ্যবিত্ত চিন্তার কাছে যমের মত ভয়ের জিনিষ। তাই গান্ধীবাদে স্থান পেল শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণী সমন্বয়, তার ন্যাসবাদ, Theroy of trusteeship মধ্যবিত্তের যতটুকু শোষণ বিরোধী নীতি আছে তারইরূপ। তাই গান্ধীজী সর্ব্বহারার একনায়কত্বকে মানতে রাজী নয় কিন্তু একজন benevolent despot এর একনায়কত্ব মানতে প্রস্তুত। রামরাজ্য তাঁর আদর্শ। বিপ্লবভীতির জন্যেই বারবার তিনি জাতীয় আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন। গান্ধীবাদ তাই পুঁজিবাদকে দূর করতে পারেনি, পুঁজিবাদকে কায়েম করেছে; গান্ধীজী তা চেয়েছিলেন কি চান নি সে কথা বিচার্য্য বিষয় নয়। তবে এই বিশ্লেষণ থেকে যদি কেউ বোঝে গান্ধীজী ভারতীয় জনতাকে ধাপ্পা দিয়ে জেনেশুনে পুঁজিবাদী শোষণ প্রতিষ্ঠার কাজে Conscious agent হিসেবে কাজ করেছেন তাহলে ভুল করা হবে। তার শ্রেণীস্বার্থ তাঁর নির্জ্ঞান মনের মধ্যে থেকে কাজ করিয়ে নিয়েছে, তাঁর চিন্তাধারা তাঁর মধ্যবিত্ত সুলভ শ্রেণী স্বার্থ দ্বারা গঠিত, চালিত ও রূপায়িত হয়েছে। গান্ধীবাদকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় 'Gandhism is a sublimatic transformation of the bourgeois class-instinct originated through the process of synthesis of the senses of bourgeois moral values and anti-workingclass fear complex of revolution of the petty bourgeoisie" (Gandhism and Fascism-Com Shib das Ghosh)।

এই ত গেল মধ্যবিত্তের চিন্তাধারার একদিক। অন্যদিকে আবার রয়েছে অতিবিপ্লববাদ। শ্রমিক কৃষকের মিলিত শক্তিতে এদের বিশ্বাস নেই; এরা ভাবে কয়েকজন কিংবা বড় জোর একটা দলের যান্ত্রিক প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে কোন এক দেশে বিপ্লব ঘটানো যায়। এরা ভুলে যায় লাখে লাখে কোটীতে কোটীতে মানুষ বিপ্লবের অপরিহার্য্যতা না বুঝলে, বিপ্লবী দলের পেছনে এসে না দাঁড়ালে অন্ততঃ পক্ষে শোষক শাসকশ্রেণীর পক্ষ হতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাদের সমর্থন টেনে নিয়ে আসছে ততদিন সফল গণবিপ্লব হতে পারে না। এই petty bourgeois revolutionism এর জন্ম মধ্যবিত্তসুলভ ধৈর্য্যহীনতায়, অস্থির চিত্ততায়। বিপ্লব রাতারাতি হয় না, দীর্ঘদিন ধরে ধৈর্য্য সহকারে তার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হয়। অথচ মধ্যবিত্তদের সে ধৈর্য্যের অভাব; তাই অসময়ে লাফিয়ে পড়ে তারা চূড়ান্ত সংগ্রামে, তাদের ভাবালুতা তাদের বিপ্লবী প্রস্তুতিকে চালিত করে, বাস্তব অবস্থার সঠিক জ্ঞান কিংবা, যুক্তি নয়। কেউ প্রাণ দেয়, কেউ বা কিছুদূর গিয়ে ভাবালুতা কেটে গেলেই বসে পড়ে বলে—না কিছু হবে না দেখলাম ত চেষ্টা করে, আবার কেউ হয়ত উগ্র উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধনিকস্বার্থ রক্ষার কাজে নেমে পড়ে জাতীয়তার নাম করে, জাতীয় সমাজতন্ত্রের দোহাই পেড়ে। বৃহত্তর অর্থে ট্রটস্কিবাদ এই অতিবিপ্লববাদ মধ্যবিত্তসুলভ সুবিধাবাদেরই নামান্তর।

বাঁচতে হলে শ্রমিক কৃষকের পাশে সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়তে হবে

ওপরে যা বলা হল তা শ্রেণী হিসেবেই বলা হল ব্যক্তিগতভাবে নয়। ব্যক্তিগতভাবে বহু বুদ্ধিজীবিই বিপ্লবের জন্যে লড়েছেন, লড়ছেন ও লড়বেন বটে। তবে তাঁদের চিন্তা ও কাজের দ্বারা নিজেদের স্বার্থ শ্রমিক স্বার্থের সঙ্গে এক বলে প্রমাণ করেছেন ও করবেন। তাঁরা বুঝেছেন সারা পৃথিবী আজ যেখানে দুটো পরস্পর বিরুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে যার একদিক চেষ্টা করছে পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে আর একদিক লড়ছে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের জন্যে সেখানে সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে সাহায্য না করলে মৃত্যুকে ডেকে আনা হবে। একচেটে পুঁজিবাদের যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশীরভাগ, সামান্য মুষ্টিমেয় কয়েক জন উচ্চ মধ্যবিত্ত ছাড়া সকলেই আজ চূড়ান্ত শোষিত। শ্রমিক চাষীর শোষণের চেয়ে তাদের শোষণ এতটুকুও কম নয় বরং চাষীমজুররা যেখানে লোক লৌকিকতা সামাজিকতাকে গ্রাহ্য করে না সেখানে তাকে সম্মান করায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুঃখ, দৈন্য, দুর্দ্দশা তাদের চেয়ে আরও বেশী। এ প্রাণান্তকর অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে শোষণের ভিৎ উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তা জোড়াতালির কাজ নয় তা একমাত্র আমূল পরিবর্ত্তনেই আসতে পারে। তাই গান্ধীয় অর্থনীতি কিংবা মিশ্র অর্থনীতি কোনটাই মধ্যবিত্তের মুক্তি এনে দেবে না। সমাজতন্ত্রই মানুষকে মজুরীর দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে প্রকৃত স্বাধীন মানুষ হতে সাহায্য করে। আর যে সমাজতন্ত্রের জন্যে মজুর চাষী লড়ছে। মধ্যবিত্তকেও তাদের পাশে এই পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রামে ঠাঁই করে নিতে হবে।

২৪শে এপ্রিল সাড়ম্বরে জন্মদিবস পালন

২৫শে ও ২৬শে গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক ক্লাস

বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শতাধিক প্রতিনিধির যোগদান

১১শ পৃষ্ঠার পর।

এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ। শেষে কমরেডদের কাছে একনিষ্ঠ হয়ে সমাজতন্ত্রের লড়াইকে আরও জোরদার করার উদাত্ত আহ্বান দিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। এই হচ্ছে কমরেড ঘোষের দীর্ঘ এক ঘণ্টার বক্তৃতার সারাংশ।

এর পর বিহারের শ্রমিক নেতা কমরেড প্রীতিশ চন্দ জয়প্রকাশী সমাজতন্ত্রের ও আই. এন্. টি. ইউ. সির ধাপ্পা ও তাদের দালালী নেতৃত্বকে বিশ্লেষণ করে বলেন যে সোস্যাল-ডিমোক্রেসিকে খতম না করে সমাজতন্ত্রে পৌছান যাবে না। আর সে লড়াই সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার সঠিকভাবেই করে আসছে তার আজন্মকাল ধরে। আর এ লড়ায়ে সমস্ত শ্রমিক চাষীকে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন।

এস. ইউ. সি ছাত্রব্যুরোর সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত তাঁর বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতের ছাত্র-আন্দোলনের বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করে বলেন যে এই ছাত্র-সম্প্রদায় ছিল সে আন্দোলনের শিরদাঁড়া। আজ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতার সংগে সংগে কংগ্রেসী সরকার একদিকে যেমন শ্রমিক আন্দোলনকে পিষে মারবার নব নব কৌশল নিচ্ছে, তেমনি ছাত্র আন্দোলনকে দাবিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তার চেষ্টার ক্রটি নেই। এদের মতে মেধাবী ছাত্র ছাড়া কলেজে ভর্ত্তি করা হবে না, কোনরকম আন্দোলনে ছাত্ররা জড়িত থাকতে পারবে না এবং বাস্তহারার সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে কলেজে ছাত্র ভর্ত্তি করার সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া—এই সব সরকারী নীতির উল্লেখ করে কমরেড দাশগুপ্ত বলেন যে সরকারের এই ছাত্র-ছাটাই-নীতিকে রুখতে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এর পর উইমেন্স্ কালচারাল এসোসিয়েশনের সহ-সম্পাদিকা কমরেড গায়ত্রী দাশগুপ্তা, ডক-মজদুর নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জি, শ্রমিক নেতা কমরেড রবি বোস, কৃষক নেতা কমরেড অপরেশ চ্যাটার্জ্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে এস. ইউ. সির সঠিক নেতৃত্বের বিশ্লেষণ করে সমস্ত মেহনতী জনতাকে এস. ইউ. সির লাল ঝাণ্ডার তলায় একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানান।

এস. ইউ. সি দিবস উপলক্ষে গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল তারিখে পার্টির সভ্য ও সমর্থকদের নিয়ে এক গ্রীষ্মকালীন রাজনৈতিক ক্লাস (Summer School of Politics) এর ব্যবস্থা হয়। এই সব ক্লাসে মার্কসবাদ ও জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন নিয়ে আলোচনা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক আলোচনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় ইংগ-মার্কিণ ব্লকের নেতৃত্বে বিশ্বপুঁজিবাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ও দুনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির শান্তির লড়াই সম্পর্কে।

এ ছাড়া ঐ দুই তারিখে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধির এক সম্মেলনে অন্যান্য আলোচনার সংগে বিশেষ করে দলের সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক পরিবেশক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।